কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যরচনায় ভাবনা-বৈচিত্র্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করার জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০২২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সৌমিত্র শেখর

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপনকারী

তামান্না কবীর

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩০৪

সেশন: ২০০৯-২০১০

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ড. সৌমিত্র শেখর
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র করা যাচ্ছে যে, তামান্না কবীর আমার তত্ত্বাবধানে বাংলা বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করার নিমিত্তে 'কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যরচনায় ভাবনা-বৈচিত্র্য' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটির কাজ আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করেছে। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা লাভের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. সৌমিত্র শেখর
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা ৪

প্রথম অধ্যায়:
বিশ শতকের প্রথমার্ধ: সমাজ ও রাজনীতি ৮

দ্বিতীয় অধ্যায়:
নজরুল মানস ২৯

তৃতীয় অধ্যায়:
নজরুলের গদ্যরচনা: সাধারণ পরিচিতি ৪১

চতুর্থ অধ্যায়:
প্রথম পরিচ্ছেদ: নজরুলের উপন্যাসে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা ৪৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নজরুলের ছোটগল্পে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা ৭৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নজরুলের প্রবন্ধ ও অভিভাষণে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা ৮৪
চতুর্থ পরিচ্ছেদ: নজরুলের চিঠিপত্রে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা ১০৩

উপসংহার ১১৪

আকরগ্রন্থাবলি ১১৬
সহায়ক গ্রন্থাবলি ১১৭

ছবিতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১২০

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাবনা

একজন লেখক বা ব্যক্তিকে সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে ও ঘনিষ্ঠরূপে পাওয়া যায় তার চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণ ও আত্মজীবনীতে। গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং ভাষণ-প্রতিভাষণেও লেখক বা ব্যক্তির অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষরূপে প্রতিফলিত ও উদ্ভাসিত হয় বটে, কিন্তু সে-সবের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের বাইরেও এক ধরনের ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সর্বজনীন ব্যাপার থাকে– যার জন্যে তাকে কল্পনা ও শিল্পরূপের আশ্রয় নিতে হয়। চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণ ও আত্মজীবনীতে লেখক যতটা খোলামেলা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বাস্তবাদী হতে পারেন; গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যকর্মে ততটা পারেন না। এক্ষেত্রে লেখকের ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-হতাশা, সংগ্রাম-সাধনা এবং সাফল্য-ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত ধরা পড়লেও শিল্পরূপের আড়ালে তা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে।

তবে লেখক বা ব্যক্তি সবচেয়ে ঘনিষ্ঠরূপে ও অন্তরঙ্গভাবে এবং শিল্পরূপী কৃত্রিমতার আড়াল ছিন্ন করে তার চিঠিপত্রেই বেশি উদ্ভাসিত হন। সন্দেহ নেই যে, অনেক সৃষ্টিশীল লেখকের চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণ এবং আত্মজীবনীমূলক রচনা শিল্পসৃষ্টি ও অনন্য সাহিত্যকর্ম হিসাবে পরিগণিত। লেখক-সাহিত্যিক-শিল্পীরা সামাজিক মানুষ এবং পরিবারের বাসিন্দা। তারাও দেশ, সমাজ এবং পারিবারিক পরিবেশের বাসিন্দা হিসাবেই জীবনযাপন, সাহিত্যকর্ম ও শিল্প-সাধনা করেন এবং সামাজিক ও পারিবারিক দায়-দায়িত্বও তাদের পালন করতে হয়। অনেক লেখক-সাহিত্যিক-শিল্পীকে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে, বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকতে হয়। আত্মজীবনীতে এবং ভাষণ-প্রতিভাষণে সেই অবস্থার প্রতিফলনও ঘটে।

কাজী নজরুল ইসলাম কোনো আত্মজীবনী বা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনা করেননি; তাঁর গল্প, উপন্যাস ও অন্যান্য রচনায় কবির সংগ্রামী, বর্ণাঢ্য জীবন,

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-সাধনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং স্মৃতিচারণ ও আত্মজীবনীর উপাদান থাকলেও, সে-সব ধারাবাহিক বা অবিচ্ছিন্ন নয়, সবক্ষেত্রে সুগ্রথিতও নয়। সে-সব রচনায় নানা ঘটনা ও চরিত্রের আদলে এবং প্রতীকরূপের মধ্যে দিয়ে বিদ্রোহী নজরুল, সংগ্রামী স্বদেশপ্রেমিক নজরুল, প্রকৃতিপ্রেমিক ও মানবতাবাদী নজরুল, স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও জাতীয় নবজাগরণের নায়ক নজরুল, কবি ও গীতিকার নজরুল, প্রেমিক নজরুল ইত্যাদি বহু বিচিত্ররূপে এক অখণ্ড নজরুলকে পাওয়া যায়– যিনি বাংলা সাহিত্যে অন্যতম যুগ-স্রষ্টা কবি, অনন্যসাধারণ গীতিকার ও সুরস্রষ্টা এবং জাতির হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত। ব্যক্তি নজরুল, সংগ্রামী নজরুল, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশের বাসিন্দা এবং নানা প্রতিকূল পরিবেশ ও দুঃখ-দৈন্যের শিকার, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত নজরুলের অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় বেশি মেলে তাঁর চিঠিপত্রে, ভাষণে ও প্রতিভাষণে। আবার বহু পত্রে, ভাষণ ও প্রতিভাষণে নজরুলের মহান কবি ও শিল্পী-সত্তা, তাঁর ব্যক্তিগত মন-মানসিকতা, সামাজিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, হৃদয়ধর্ম ও সৃষ্টি-রহস্যের পরিচয় উদ্ভাসিত। সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সে-সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিদ্রোহী কবি কীভাবে সৃষ্টির বিচিত্র ফুল ফুটিয়েছেন, তার পরিচয় আছে নজরুলের পত্রাবলিতে, তাঁর ভাষণ-প্রতিভাষণে। আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘর করেছেন নজরুল, আর্থিক সৌভাগ্য তাঁকে কখনও কখনও স্পর্শ করলেও বিষয়-বুদ্ধির অভাবে সেই সৌভাগ্য স্পর্শমণি তিনি ধরে রাখতে পারেননি। বেনিয়া প্রকাশকদের ও গ্রামোফোন কোম্পানির ব্যবসা-বুদ্ধির কাছে ঠকেছেন, প্রতারিত হয়েছেন, এবং পরিণামে দারিদ্র্যই হয়েছে তাঁর আজীবন সঙ্গী। তাই সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা ও অসাধারণ প্রাণশক্তির অধিকারী নজরুল লিখেছেন: 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি।'[১] দুঃসহ দারিদ্র্যের সঙ্গে নজরুল ও তাঁর পরিবারকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্যে এবং পরিবারের প্রতি সুগভীর মমতার টানে বিদ্রোহী কবিকে অনেকক্ষেত্রে অসহায় অবস্থায় নমনীয় হতে হয়েছে, শিল্পসৃষ্টিকে উৎসর্গ করতে হয়েছে আর্থিক প্রয়োজনের বেদিতে। তার বেদনা-করুণ পরিচয় বিধৃত রয়েছে কবির পত্রাবলিতে।

---

১. কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী, অগ্নি-বীণা, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, পৃ.-১০

২. কাজী নজরুল ইসলাম, চির-বিদ্রোহী, শেষ-সওগত, নজরুল রচনাবলী-৫ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৬৯

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল বলেছেন: 'বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান'।[২] তিনি আরও বলেছেন, 'যেথায় মিথ্যা ভণ্ডামী ভাই করবো সেথায় বিদ্রোহ।'[৩] প্রেমিক কবি, মানবতাবাদী কবি এবং সত্য ও ন্যায়ের সমর্থক সংগ্রামী কবি নজরুলের অভিমান কেমন করে তাঁকে বিদ্রোহীতে পরিণত করেছে, তার পরিচয় আছে পত্রাবলিতে। নার্গিসের সঙ্গে নজরুলের প্রেম, পরিণয় ও বিবাহ-বিচ্ছেদের সুদীর্ঘকাল পরে তাঁকে লেখা এক অনবদ্য পত্রে নজরুল লিখেছিলেন 'তুমি এই আগুনের পরশমাণিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না। আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।'[৪] ১৯২১ সালে নার্গিসের সঙ্গে প্রেম ও পরিণয়ের পরই রচিত হয় অভিমানী নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা এবং আত্মপ্রকাশ করে 'ধূমকেতু' পত্রিকা। ফজিলাতুন্নেসাকে লিখিত কবির পত্রাবলির কথা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নজরুল যে শুধু সৃষ্টিশীল স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবিই নন, তিনি যে সৃষ্টিশীল ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী গদ্যশিল্পীও তার পরিচয় কবির পত্রে এবং ভাষণ-প্রতিভাষণে দীপ্ত হয়েছে। গবেষণা কর্মের সার-সংক্ষেপ 'উপসংহারে' উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার প্রয়োজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সেমিনার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ফেনী গণগ্রন্থাগার, নজরুল ইন্সটিটিউটের সাহিত্য বিষয়ক সহায়ক গ্রন্থ পাঠের সুযোগ ও সহযোগিতা পেয়েছি। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সবার উপদেশ ও নির্দেশনাকে স্মরণ করছি।

---

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহীর বাণী, বিষের বাঁশি, নজরুল রচনাবলী-১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-১৪৪

৪. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, ২০১২, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ.-৮৯

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহী, অগ্নি-বীণা, আর্য্য পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
২. কাজী নজরুল ইসলাম, চির-বিদ্রোহী, শেষ-সওগত, নজরুল রচনাবলী-৫ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩. কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্রোহীর বাণী, বিষের বাঁশি, নজরুল রচনাবলী-১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, ২০১২, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

বিশ শতকের প্রথমার্ধঃ সমাজ ও রাজনীতি

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বাংলা সাহিত্যে ও ইতিহাসে তিনি বিদ্রোহী কবি এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত। তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী কবিতার জন্যই ত্রিশোত্তর আধুনিক কবিতার সৃষ্টি সহজতর হয়েছিল। নজরুল ইতিহাস চেতনায় ছিলেন সমকালীন এবং দূর ও নিকট অতীতের স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিত্ব। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাঙালির সমগ্র সংস্কৃতিকে যিনি ব্যাপক ও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছেন তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানকে নজরুল ছাড়া কে চেয়েছেন এমনভাবে মেলাতে? মাত্র ২৩ বছরের সৃষ্টিশীল জীবন তাঁর (১৯১৯-৪২)। কিন্তু তার মধ্যে কতো রূপেই না তাঁর আত্মপ্রকাশ! একাধারে তিনি কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, শিশুসাহিত্যিক, গীতিকার, গীতিনাট্য রচয়িতা, সুরকার, স্বরলিপিকার, গায়ক, বাদক, সংগীতজ্ঞ, সংগীত পরিচালক, সাংবাদিক, সম্পাদক, পত্রিকা পরিচালক, অভিনেতা, চলচ্চিত্র কাহিনিকার, চলচ্চিত্র পরিচালক। স্বীকৃতিও পেয়েছেন ঠিক সেরকমই। বইয়ের সংস্করণের পর সংস্করণ ছাপা হয়েছে। বইয়ের পর বই বাজেয়াপ্তও হয়েছে। জীবদ্দশাতেই কিংবদন্তির নায়কে পরিণত হয়েছিলেন। একাধিক বিবাহ, অনেক প্রেম, দুটি সন্তানের মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর সুস্থাবস্থায় শেষ কয়েক বছর স্ত্রী রুগ্‌ণ ও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। চরকির মতো ঘুরেছেন পশ্চিম ও পূর্ববাংলার জেলার জেলায়, চারণ কবির মতো আবৃত্তি করে ও গান গেয়ে ফিরেছেন। সমকালীন ফরাসি কবি গিয়োম আপোলি নেয়ার (১৮৮০-১৯১৮) বা হিস্পানিক কবি ফেরেদিকে গারথিয়া লোরকার (১৮৯৮-১৯৩৬) মতো তাঁরও জীবনকাল ছিল অল্পদিনের কিন্তু অসম্ভব বর্ণাঢ্য, গতিশীল এবং অনেক বেশি লোকপ্রিয়।

সার্বভৌম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলকে গ্রন্থ উৎসর্গ করে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। সমালোচক-চূড়ামণি মোহিতলাল মজুমদার তাঁকে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম উন্মেষকালেই স্বাগত জানিয়েছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের পরে শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে স্নেহ করতেন। সুভাষচন্দ্র বসু উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর জাগরণমূলক কবিতা ও গানের দ্বারা। জীবনানন্দ দাশ তাঁকে নিয়ে দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসগ্রন্থে নজরুলের জন্য একটা পরিচ্ছেদ লিখেন। ১৯২৯ সালে মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি 'জাতীয় কবি' পদে অভিষিক্ত হন। তাঁর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধতাও কম হয়নি। কিন্তু সবকিছুর পরও নজরুল আজ বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান পুরুষ। প্রস্তাবিত গবেষণার প্রাথমিক উৎস ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত রচিত কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও চিঠিপত্রসমূহ। নিম্নে গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করা হলো:

উপন্যাসসমূহ:	**প্রকাশ সাল**
১. বাঁধন-হারা	১৯২৭
২. মৃত্যুক্ষুধা	১৯৩০
৩. কুহেলিকা	১৯৩১

ছোটগল্প:

গ্রন্থের নাম	**অন্তর্ভুক্ত গল্পের নাম**	**প্রকাশকাল**
১. ব্যথার দান	১. ব্যথার দান	১৯২২
	২. হেনা	
	৩. বাদল-বরিষণে	
	৪. ঘুমের ঘোরে	
	৫. অতৃপ্ত কামনা	
	৬. রাজবন্দীর চিঠি	

২. রিক্তের বেদন	১. রিক্তের বেদন	১৯২৪
	২. মেহের-নেগার	
	৩. স্বামীহারা	
	৪. রাক্ষুসী	
	৫. সালেক	
	৬. সাঁঝের তারা	
	৭. বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী	
	৮. দুরন্ত পথিক	
৩. শিউলিমালা	১. শিউলিমালা	১৯৩১
	২. পদ্ম-গোখরো	
	৩. জিনের বাদশা	
	৪. অগ্নি-গিরি	

প্রবন্ধঃ

গ্রন্থের নাম	**অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের নাম**	**প্রকাশকাল**
১. যুগবাণী	১. নবযুগ	১৯২২
	২. গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ!	
	৩. ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ	
	৪. মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?	
	৫. লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলকাতার দৃশ্য	
	৬. ধর্মঘট	
	৭. ছুৎমার্গ	
২. দুর্দিনের যাত্রী	১. মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা	১৯২৬
	২. আমি সৈনিক	
	৩. আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল	

৩. রুদ্রমঙ্গল	১. রুদ্রমঙ্গল	১৯২৭
	২. ধূমকেতুর পথ	
	৩. মন্দির ও মসজিদ	
	৪. হিন্দু-মুসলমান	

সমকালীন পটভূমির উপরই নজরুলের কথাসাহিত্য-সম্ভার দাঁড়িয়ে আছে। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা উত্থান-পতনের কারণে নজরুলের মানসিকতা হয়ে ওঠে বিদ্রোহী। নজরুল ছিলেন অবহেলিত সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বলয়ের প্রতিনিধি। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় তিনি দেখতে পান সামাজিক কুসংস্কার, নারীর প্রতি বৈষম্য, সংকীর্ণতা, ধর্ম-বর্ণ লিঙ্গভেদ ইত্যাদি। প্রচলিত এসব সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরুল তাঁর কথাসাহিত্যে নির্দেশের পাশাপাশি একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার নির্দেশনা দেন। 'দুরন্ত পথিকে' নজরুল লিখেছেন:

> "দুরন্ত পথিক চলিয়াছিল, সেই মুক্ত দেশের উদ্বোধন-বাঁশির সুর ধরিয়া।...এইবার তাহার পথের বিভীষিকা জুলুম আরম্ভ করিল। পথিক দেখিল, ঐ পথ বাহিয়া যাওয়ায় এক-আধটুকু অস্ফুট পদচিহ্ন এখনো যেন জাগিয়া রহিয়াছে। পথের বিভীষিকা তাহাদেরই মাথার খুলি এই নতুন পথিকের সামনে ধরিয়া বলিল– 'এই দেখ এদের পরিণাম'। সেই খুলি মাথায় করিয়া নতুন পথিক আর্তনাদ করিয়া উঠিল,– 'আহা, এরাই তো আমায় ডাক দিয়াছে! আমি এমনই পরিণাম চাই– আমার মৃত্যুতেই তো আমার শেষ নয়, আমার পশ্চাতে ঐ যেন তরুণ যাত্রীর দল, ওদের মাঝখানেই আমি বেঁচে থাকব"।[১]

কাজী নজরুল ইসলাম এখানে সমাজের যে আদর্শ রূপরেখার প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে মানুষ ও মানবতা, প্রগতি ও আধুনিকতা। নজরুল সমাজের ভেতর থেকে বিভিন্ন গলদ, কুসংস্কার, ভেদ-বৈষম্য ও অমানবিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর তিন উপন্যাসসহ উনিশটি ছোটগল্পের প্রায় অধিকাংশটিতে এসবের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ফলে সমকালীন পটভূমিতেই গড়ে উঠেছে তাঁর সকল কথাসাহিত্যের মূলবক্তব্য।

---

১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২৯৯

সমকালীন তিনটি প্রধান রাজনৈতিক বক্তব্যও উঠে এসেছে তিনটি উপন্যাসে– 'বাঁধন-হারা' প্রথম মহাযুদ্ধের আবহে, 'কুহেলিকা' স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের আবহে এবং 'মৃত্যুক্ষুধা' অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলন এবং রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আবহে রচিত। এসব আন্দোলনে তখনকার সমাজ ছিল চরম সংকটাপন্ন। এসব আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় সমাজের প্রতিটি স্তরে চলছিল ক্রমাগত পালাবদল। আর এসব পালাবদলের সমকালীন চিত্র ফুটে উঠেছে নজরুলের কথাসাহিত্যে।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের গজালের মার সংসার, কৃষ্ণনগর, চাঁদ সড়কের মুসলমান-খ্রিষ্টান সহবাস, তাদের জীবনযাত্রা, খ্রিষ্টানদের ধর্মপ্রচার; 'কুহেলিকা' উপন্যাসের জমিদারদের ব্যাভিচার, মেসের জীবনযাত্রা, জারজ সন্তানের সামাজিক মর্যাদ;, 'বাঁধন হারা' উপন্যাসের মুসলমানদের রীতিনীতি, হিন্দু সমাজের জাতিভেদপ্রথা, ব্রাহ্মদের মানবিকতাবোধ– এ সবই সমকালীন পটভূমিকে চিহ্নিত করে।

উনিশটি ছোটগল্পের মাঝে ব্যথার দান, হেনা, ঘুমের ঘোরে, রাজবন্দীর চিঠি, রিক্তের বেদন, বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মেহের-নেগার গল্পগুলোতে সমকালীন যুদ্ধ ও রাজনীতির সাথে সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। সালেক, রাক্ষুসী, স্বামীহারা, পদ্ম গোখ্‌রা নিটোল সামাজিক পটভূমিতে রচিত। 'দুরন্ত পথিক' গল্পটিকে লেখক নিজেই 'কথিকা' বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে কথকের বর্ণনাতে সমকালীন সমাজের একটি পটভূমির অবতারণা ঘটেছে। গবেষণার বিষয় সমাজ হলেও রাজনীতি যেহেতু এর অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নজরুলের কথাসাহিত্যের পটভূমি, তাই বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোও খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো।

বঙ্গভঙ্গ:

বাঙালির বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের উপর ইংরেজ সরকারের বরাবরই নজর ছিল বিদ্বেষপূর্ণ। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জন এদেশে এসেই এই জাতীয়তাবোধকে

দমানোর চেষ্টা করলেন। বঙ্গ বিভাগের ফলে শাসনকার্য সহজতর হবে এটাই ছিল তাদের প্রধান যুক্তি। তাছাড়া হিন্দুদের তুলনায় পূর্ববঙ্গের অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতি সাধনের ইচ্ছার প্রতিফলনই বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত। জনসাধারণের প্রবল আন্দোলনের মুখে ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয়। বঙ্গকে দ্বি-খণ্ডিত করা হলেও এরপর প্রবলভাবে তার বিরোধিতা করে বাঙালিরা। ঐ দিনই রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পরিকল্পনায় রাখিবন্ধন উৎসব শুরু করে। আন্দোলনের প্রধান কর্মসূচি ছিল বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বদেশি শিল্পপণ্যের ব্যবহার ও প্রচার এবং জাতীয় ভাবাদর্শের উন্মেষসাধন। ঐ সময়েই প্রথম 'বন্দে মাতারম' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ক্রমান্বয়ে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে রূপ নিতে থাকে। যার ফলে উদ্ভব হয় স্বদেশি আন্দোলনের।[২]

নজরুলের কথাসাহিত্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সরাসরি কোনো ছাপ পড়েনি। যেহেতু পরবর্তী আন্দোলনসমূহ শুরু হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকেই। তাই পরবর্তী স্বদেশি আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন– যা নজরুলের কথাসাহিত্যে ফুটে উঠেছে, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন:

বঙ্গভঙ্গের সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরই সূত্রপাত হয় স্বদেশি আন্দোলনের। এ আন্দোলনের মূলকথা ছিল বিলেতি দ্রব্য বর্জন, বিলেতি পোশাক-পরিচ্ছদ বর্জন, ভাব ও চিন্তাধারাসহ সর্বপ্রকার বিদেশি আদর্শের পরিবর্তে জাতীয় অর্থাৎ স্বদেশি ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা পদ্ধতি, রাজনীতিক আদর্শ, লক্ষ্য ও পন্থা অবলম্বন– যা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও প্রভাবিত করেছিল। ১৯০৫ সালের শেষে কংগ্রেসের একটি অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে বাংলায় ব্রিটিশপণ্য বর্জনকে সমর্থন দেওয়া হয়।

এক পর্যায়ে স্বদেশি আন্দোলনরত বিপ্লববাদীদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং পরে এ থেকেই শুরু হয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের। স্বদেশি, সন্ত্রাসবাদী এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে রচিত 'কুহেলিকা'

---

২. প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, পৃ.-১১২-১১৩।

উপন্যাস। নজরুল যখন সিয়ারসোল স্কুলে পড়তেন তখন বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক নজরুলকে বিপ্লববাদে প্রভাবিত করেছিলেন। 'কুহেলিকা' উপন্যাসে নিবারণচন্দ্র ঘটকের ছায়া লক্ষ্য করা যায় এভাবে– "এমনি দিনে জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী মন্ত্রে এই কল্পনাপ্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক স্কুল মাষ্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লবী।"[৩]

সন্ত্রাসবাদ বা বিপ্লববাদ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে। বিপ্লব যুগ ছিল বীরত্ব আত্মত্যাগ ও নির্যাতনের যুগ। বিপ্লবীরা জানতেন ধরা পড়লে তাদের মৃত্যু বা দীপান্তর নিশ্চিত। সুতরাং নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও কাজ করতে হতো। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে নায়কের পরিণতি দেখানো হয়েছে।

> বজ্রপাণি প্রমত্তর সাথে জাহাঙ্গীরেরও দ্বীপান্তর হইল। তাহার সত্যকার নাম প্রকাশ পাইল না। জাহাঙ্গীর তাহার নাম বলিয়াছিলেন স্বদেশ কুমার। সেই নামেই তাহার শাস্তি হইয়া গেল। ফিরদৌস বেগম ও দেওয়ান সাহেব লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়াও কোন কিনারা করিতে পারিলেন না।[৪]

'কুহেলিকা' উপন্যাসে সমকালীন সমাজের সাম্প্রদায়িক ভাবনারও প্রকাশ পাওয়া যায়। মুসলমান জাহাঙ্গীরকে নিয়ে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা এবং বিরোধ দেখা যায় তাদের মাঝে।

স্বদেশি আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, দমন ও শোষণনীতি এসব আন্দোলন একটি আরেকটির পরিবর্তিত রূপ, যা সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে মাত্র। বঙ্গভঙ্গ রোধ করার প্রয়াস নিয়েই শুরু হয়েছিল স্বদেশি আন্দোলন। ক্রমে তা সন্ত্রাসবাদী এবং দমন ও শোষণনীতি আন্দোলনের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। 'কুহেলিকা'র এগারো অনুচ্ছেদে এই স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে।

> "জয়তীর ছোট বোন সন্তান প্রসব করিয়াই মারা যায়। সে ছেলেকে জয়তী লইয়া আসিয়া মানুষ করেন। নাম রাখেন পিণাকপাণি। সকলে পিণাকি বলিয়া ডাকিত। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া গত বৎসর তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ফাঁসির মঞ্চেও সে জীবনের জয়গান গাহিয়াছে। ...ফাঁসির পূর্বে

---

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-৩য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২৭২।

৪. প্রাগুক্ত।

ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তুমি কি কাউকে দেখতে চাও? পিণাকি হাসিয়া বলিয়াছিল চাই, কিন্তু তুমি তো দেখাতে পারবে না। ম্যাজিস্ট্রেট তার শিশুর মত মুখের পানে তাকাইয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল নিশ্চয়ই পারব। বল কাকে দেখতে চাও? পিণাকি তেমনি মধুর হাসিতে মুখ আলো করিয়া বলিয়াছিল, আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা দেখতে। পারবে দেখাতে?"[৫]

<u>প্রথম মহাযুদ্ধ:</u>

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে কাজী নজরুল ইসলামের বেশ কয়েকটি ছোটগল্পসহ পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা'র। এ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট। জার্মানি বেলাজিয়ামকে আক্রমণ ও অধিকার করলে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশরূপে এ যুদ্ধে ভারত অংশগ্রহণ করে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছে এবং জার্মান সৈন্য যখন দ্রুত বেগে প্যারিসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন ভারতের গুর্খা সৈন্যদলের রণকৌশল ও বিক্রমই যে তাদের অগ্রগতি রোধের প্রধান কারণ তা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

নজরুলের কথাসাহিত্যের শুরুই হচ্ছে বাঙালি পল্টন ময়দান থেকে। করাচি সেনানিবাসে বসে নজরুল লেখেন প্রথম ছোটগল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে নজরুল ১৯১৭ সালের শেষের দিকে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। নওশেরায় তিন মাস প্রশিক্ষণের পর তাঁর কোম্পানির সাথে তিনি করাচি যান। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নজরুল ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মার্শাল হাবিলদার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। 'হেনা' গল্পটিতে এর প্রমাণও রয়েছে এভাবে– 'আমার কমান্ডিং অফিসার বলেছেন, "তুমকো বাহাদুরি মিল যায়েগা।" আজ আমি হাবিলদার হলুম।'[৬] করাচি সেনানিবাসে বসে নজরুল রচনা করেছেন 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'স্বামীহারা', 'হেনা', 'ব্যথার দান', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে' ছোটগল্প। তার মধ্যে 'হেনা', 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী', 'মেহের নেগার', 'ঘুমের ঘোরে' চারটি গল্পেই রয়েছে তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা রয়েছে 'হেনা' গল্পে।

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩১৪-১৫

৬. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২১০।

"ও! কি আগুন বৃষ্টি! আর কি তার ভয়ানক শব্দ! গুড়ুম-দ্রুম-দুম! আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না, যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে! গোলা আর বোমা ফেটে ফেটে আগুনের ফিনকি এত ঘন বৃষ্টি হচ্ছে যে, অত ঘন যদি জল ঝরত আসমানের নীল চক্ষু বেয়ে, তা'হলে একদিনেই সারা দুনিয়া পানিতে সয়লব হয়ে যেত।"[৭]

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং রুশ বলশেভিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত হয়েছে 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। খিলাফত শব্দটি এসেছে খলিফা থেকে। খলিফা যে জায়গাটুকুর উপর তাঁর কর্তৃত্ব পরিচালনা করতেন, মুসলিম বিশ্বে সেই জায়গাটুকুকেই খিলাফত নামে অভিহিত করা হতো। ১৯১২ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত তুরস্কের সম্রাট ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলিফা। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর খলিফার ভবিষ্যত বিপন্ন হয় এবং ভারতের মুসলিম সমাজকে তা বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে। তুরস্কের খলিফার প্রতি ইংরেজ ও তার মিত্রশক্তির দুর্ব্যবহারই খিলাফত আন্দোলনের কারণ। কাজী নজরুল ইসলাম মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের সমর্থক ছিলেন। খিলাফত আন্দোলনে তাঁর আস্থা ছিল না। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের আবির্ভাব 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পনেরো অনুচ্ছেদে ঘটেছে।

"চাঁদ সড়কে সেদিন বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। লক্ষ্মীছাড়া মতো চেহারা লম্বা চওড়া একজন মুসলমান কোত্থেকে থেকে এসে সোজা নজির সাহেবের বাসায় উঠল। ...যুবকের গায়ে খেলাফতি ভলান্টিয়ারের পোষাক। কিন্তু এত ময়লা যে চিমটি কাটলে ময়লা উঠে। খদ্দরেরই জামা–কাপড় কিন্তু এত মোটা যে, বস্তা বলে ভ্রম হয়। মাথায় সৈনিকদের 'ফেটিগ-ক্যাপের' মতো টুপি, তাতে কিন্তু অর্ধচন্দ্রের বদলে পিতলের ক্ষুদ্র তরবারি-ক্রুস। তরবারি-ক্রুসের মধ্যে হিন্দু মুসলমনের মিলনাত্মক একটি লোহার ছোট্ট ত্রিশূল। হাতে দরবেশী ধরনের অষ্টাবক্রীয় দীর্ঘ যষ্টি। সৈনিকদের ইউনিফর্মের মতো কোট-প্যান্ট। পায়ে নৌকার মত এক জোড়া বিরাট বুট, চড়ে অনায়াসে নদী পার হওয়া যায়। পিঠে একটা বোম্বাই কিটব্যাগ।"[৮]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-২০২

৮. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৩৪৭

অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের পটভূমিকায় মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলাম 'নবযুগ' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন ১৯২০ সালে ১২ই জুলাই থেকে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন এ কে ফজলুল হক। এই পত্রিকায় অসহযোগ খেলাফত যুগের যেসব সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নজরুলের সৃষ্টিতে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের মূলবক্তব্য হচ্ছে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আনসার নামের এক খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের কর্মীর দল পরিবর্তন করে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের এক বিপ্লবীর মধ্য দিয়ে সমকালীন সামাজিক এ বক্তব্য তুলে ধরা হয়। পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করে একটি নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম ঘোষণা করেছিল এই বিপ্লব ১৯১৭ সালে। প্রমাণ করেছিল ধনতন্ত্রের অবক্ষয় সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী এবং এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা যা শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্থানচ্যুত করতে যাচ্ছে। যে ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণির হাতে এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক দেশের জনগণ, কোনো মুনাফা লোলুপ ব্যক্তি বিশেষ নয়।

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নামকরণের সাথেই নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণির পটভূমিটি মিশে আছে। আনসারের বক্তব্যে যখন শোনা যায়:

> "তোমাদের মৃতদেহের উপর দিয়েই আসবে তোমাদের মুক্তি। অস্ত্র তোমাদের নেই, তার জন্য দুঃখ করো না। যে বিপুল প্রাণশক্তি নিয়ে সৈনিকেরা যুদ্ধ করে, সেই প্রাণশক্তির অভাব যদি না হয় তোমাদের, তোমরাও জয়ী হবে। আর অস্ত্রই বা নাই বলব কেন? কোঁচোয়ন, তোমার হাতে চাবুক আছে? বুনো ঘোড়াকে-পশুকে তুমি চাবুক মেরে শায়েস্তা কর, আর মানুষকে শায়েস্তা করতে পারবে না!"[৯]

'ব্যথার দান' গল্পের পটভূমিতে রুশ বিপ্লবের ছাপ রয়েছে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের সময় প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তা করার জন্য ভারত থেকে ট্রান্সকেশিয়ায় প্রেরিত ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কিছু সৈনিক দলত্যাগ করে লালফৌজে যোগদান করে। সে সংবাদ রুশ বিপ্লবের খবরের মতোই সেনাবাহিনীর বিধি নিষেধ অতিক্রম করে নজরুলের কানে পৌঁছেছিল। এ থেকেই যে নজরুল পরে 'ব্যথার দান' রচনা করেছিলেন, তা অনুমান করা যায়।

---

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭১

নব্যতুর্কি ও মোস্তফা কামাল আতাতুর্কের অভ্যুত্থান নজরুলের কথাসাহিত্যে কোনো পটভূমি তৈরি করেনি। তবে বিশ শতকের প্রথম তিন দশকের রাজনৈতিক আন্দোলন যেহেতু তাঁর মানসিকতাকে গড়ে তুলেছে এবং তাঁর 'কামাল পাশা' কবিতাটি নাটকের আঙ্গিকে রচিত, তাই এ সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। ১৯১৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের পর কামাল পাশা জার্মানি যান সমর নায়ক আনোয়ার পাশা ও তালাত পাশার সঙ্গে। কিন্তু জার্মানির কাছ থেকে সাহায্যের কোনো আশা নেই জেনে আনোয়ার পাশা ও কামাল পাশা রাশিয়ায় চলে যান এবং তালাত পাশা জার্মানিতে থেকে যান। কামাল পাশা পুনরায় তুরস্কে প্রত্যাবর্তন করেন। আনোয়ার পাশা ছিলেন "প্যান ইসলামিক ও প্যান তুর্কি" আন্দোলনের প্রবক্তা। তুরস্কই প্রথম মুসলমান দেশ, যে দেশ থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ, পর্দা প্রথা বিলোপ ও মোল্লাতন্ত্র দূরীভূত হয়েছিল। এ সব কিছুর উদ্যোক্তা ছিলেন মোস্তফা কামাল পাশা।"[১০]

তুরস্কের এসব ঘটনাবলি নজরুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কারণ মোস্তফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কই প্রথম মুসলমান দেশ যেটি ধর্ম নিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রে রূপায়িত হয়। 'কামাল পাশা' কবিতাটি নজরুল এই প্রেরণা ও পটভূমিতেই লিখেছিলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ছিল ব্রিটিশদের প্রতি বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। বিপ্লবী নেতা সূর্যসেনের নেতৃত্ব ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল এটি সংঘটিত হয়েছিল। নারী বিপ্লবী প্রীতিলতাও ছিলেন এ কাজের সহযোগী। অসম সাহসী প্রীতিলতা ধরা পড়ে সায়ানাইড মুখে দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। অপরদিকে সূর্যসেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েন, পরে তাঁর ফাঁসি হয়।[১১] নজরুলের কথাসাহিত্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সরাসরি কোনো ছাপ পাওয়া না গেলেও তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসের বিপ্লবী জয়তী দেবীর সাথে নারী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

---

১০. অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক (সম্পাদিত), উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, ২০০৭, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, পৃ.-৭৪

১১. প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, প্রাগুক্ত, পৃ.-১১৯

উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকের মাঝে এ আন্দোলনগুলো নজরুলের কথাসাহিত্যের পটভূমি তৈরি করেছে। রাজনীতি সমাজের বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। সমকালীন অন্য যেসব প্রেক্ষাপট পটভূমি তৈরি করেছিল নজরুলের কথাসাহিত্যে প্রথমেই তা খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে। তিনটি উপন্যাসে সমকালীন স্পর্শকাতর তিনটি সামাজিক দিক নির্দেশিত হয়েছে এবং তিনটি দিকের সাথেই ব্যক্তি নজরুল জড়িত ছিলেন একাত্ম হয়ে। সমাজের একজন হয়ে খুঁটিনাটি সামাজিক বিষয়গুলো অবলোকন, অনুধাবন করেছেন অসম্ভব গভীর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে।

তথ্যনির্দেশ

১। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

৩। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-৩য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, মার্চ ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৪। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ২৫ মে ২০০৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫। অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক (সম্পাদিত), উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, ২০০৭, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুল মানস

[কাজী নজরুল ইসলামের জীবনকাল ১৮৯৯ খিষ্টাব্দের ২৪ শে মে থেকে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ শে আগস্ট (১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ থেকে ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ সাল) সাতাত্তর বছর তিন মাস। তাঁর পরিণত সাহিত্যিক জীবনকাল ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ খিষ্টাব্দ (১৩২৬-১৩৪৯ সাল) মাত্র তেইশ বছর।]

চুরুলিয়ার উত্তরে অজয় নদী, যার অপর পাড়ে কবি জয়দেব ও রবীন্দ্রনাথের লীলাভূমি বীরভূম, দক্ষিণে কয়লা খনি ও শিল্পাঞ্চল রানীগঞ্জ ও আসানসোল, পশ্চিমে দামোদর নদী। এই চুরুলিয়া গ্রামে কিংবদন্তি রাজা নরোত্তম সিংহের গড় আর পির পুকুরের পাশে এক মাটির ঘরে নজরুলের জন্ম। কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, ২৪শে মে, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে।[১]

কাজী নজরুল ইসলামের পিতামহ কাজী আমিন উল্লাহ, পিতা কাজী ফকির আহমদ, মাতামহ তোফায়েল আলী, মাতা জাহেদা খাতুন। কাজী ফকির আহমদের দুই স্ত্রী, সাত পুত্র ও দুই কন্যা। নজরুলের সহোদর তিন ভাই ও এক বোন। জ্যেষ্ঠ কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন, বোন উম্মে কুলসুম। কাজী ফকির আহমদের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কাজী সাহেবজানের জন্মের পর আরও চারপুত্রের জন্ম ও মৃত্যু হয়। তারপরে জন্ম হয় কাজী নজরুল ইসলামের। নজরুলের ডাক নাম রাখা হয় "দুখু মিয়া"। তাঁকে 'খ্যাপা নজর আলী' বলেও ডাকা হতো। নজরুলের নাম যারা দুখু মিয়া রেখেছিলেন তাঁরা অজান্তে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত মেনে তা করেছিলেন মনে হয়, কারণ এ মানুষটির জীবনে আর যা কিছুরই অভাব হোক দুঃখের অভাব কোনোদিন হয়নি।

নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ পরলোকগমন করেন ১৩১৪ সালের ৭ই চৈত্র (১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে)। নজরুলের বয়স তখন মাত্র নয় বছর।[২] পিতৃহীন দরিদ্র পরিবারের এই শিশুটির তখন থেকেই শুরু হয় জীবন সংগ্রাম।

---

১. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, ২০১২, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ.-০৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ.-১১

পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক অনটনের কারণে নজরুলের লেখাপড়া সুষ্ঠুভাবে চলেনি। তাই নজরুলকে ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাত্র দশ বছর বয়সে ঐ মক্তবে, হাজী পালোয়ানের কবরে, পির পুকুরের মসজিদে এবং গ্রামে কাজ করতে হয়। মক্তব, কবর ও মসজিদের সংসর্গ বালক নজরুলকে কতটা ধর্মপ্রাণ করতে পেরেছিল বলা যায় না, তবে অল্প বয়সেই যে নজরুলের ধর্মীয় রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও মুসলমান সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

দারিদ্র্য নজরুলের আবাল্য সাথী কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষরা দরিদ্র ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন পাটনার অধিবাসী এবং মোগল সম্রাট শাহ আলমের সময় পাটনার হাজিপুর থেকে চুরুলিয়ায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। চুরুলিয়া প্রাচীন গ্রাম, এখানে রাজা নারোত্তম দাস বা সিংহের রাজধানী এবং অস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্র ছিল, সে জন্যে স্থানটি চুরুলিয়া গড় নামে পরিচিত এবং পুরাকীর্তিরূপে সংরক্ষিত। মোগল আমলে এখানে একটি বিচারালয় ছিল যার সঙ্গে নজরুলের কাজী পরিবার সম্পর্কিত ছিলেন। মোঘল আমল থেকেই এই কাজী বংশ 'আয়মা' সম্পত্তি ভোগ করে আসছিলেন।[৩]

চুরুলিয়া অঞ্চলে মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন সম্পর্কে বর্ধমান জেলার গেজেটিয়ার্সে সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ অঞ্চলের মুসলমান অধিবাসীদের একটা বড় অংশ বাংলায় আগত ভাগ্যবান সৈনিকদের উত্তরসূরি; তারা সম্রাটের কাছ থেকে জমিজমা বা 'আয়মা' সম্পত্তি দান হিসেবে পেয়ে এ অঞ্চলে বসবাস করতে থাকেন। চুরুলিয়া একটি প্রাচীন স্থান এবং ঐ অঞ্চলের মুসলমানদের পূর্বপুরুষেরা অনেকেই বাংলাদেশের বাইরে থেকে আগত 'আয়মা' সম্পত্তির ভোগকারী।

কবি ও শিল্পী নজরুলের হাতেখড়ি লেটো দলে। কেবল দ্রুত কবিতা, গান বা নাটক রচনা নয়, হিন্দু পুরাণ, ইতিকথা এবং অঞ্চলের লোক সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে লেটো দলে। পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্টিতে মুসলমান ঐতিহ্যের সঙ্গে হিন্দু ঐতিহ্য এবং বাংলার গ্রামীণ ও লোক-সংস্কৃতির উপাদান ব্যবহারের যে বৈচিত্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য পরিলক্ষিত হয় তার সূত্রপাত ঘটে লেটো কবি নজরুলের রচনায়।

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-১০

কথিত আছে, নজরুল নিমসা গ্রামের লেটো দলের খুদে ওস্তাদ পর্যন্ত হয়েছিলেন। ওস্তাদ হিসেবে নজরুল সংগীত-বহুল ছন্দোবদ্ধ নাটকই রচনা করেননি, প্রয়োজনে কবির লড়াইয়ে নেমেছেন। ফরমায়েশি বা তাৎক্ষণিক রচনার অভ্যাস নজরুল এভাবে কিশোর বয়সেই রপ্ত করে ফেলেছিলেন। এমনকি ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত কবিয়াল গোদাকবি শেখ চকোর নজরুলকে ব্যাঙাচি আখ্যা দিয়ে ভবিষৎবাণী করেছিলেন, এই ব্যাঙাচি বড় হয়ে সাপ হবে।[৪] বলাবাহুল্য গোদাকবির আশা বিফল হয়নি। নজরুলের বাল্যজীবনের 'চাষার সং', 'মেঘনাদ বধ,' 'শকুনি বধ', 'দাতা কর্ণ', 'রাজপুত্র', 'আকবর বাদশা' আখ্যায়িকামূলক নাটক ও পালাজাতীয় রচনা। কিশোর কবি নজরুলের রচনার কিছু উদাহরণ এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যায়। প্রথমত, রামপ্রসাদী বাউল বা মারফতি জাতীয় রচনা:

চাষ কর দেহ জমিতে
হবে নানা ফসল এতে
নামাজে জমি উগালে
রোজাতে জমি সামালে
কলেমায় জমিতে মই দিলে
চিন্তা কিহে এই ভবেতে।[৫]

মাথরুন স্কুলের শিক্ষক এবং পরবর্তীকালে হেডমাস্টার বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র নজরুলের স্বভাব এবং আচার ব্যবহার সম্পর্কে যে পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বোঝা যায় যে বাল্যকালে নজরুল দুরন্ত ও ডানপিঠে ছিলেন ইত্যাকার প্রচলিত ধারণা যথার্থ নয়।

নজরুল সম্ভবত ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট থানার অজয় নদের তীরস্থ মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইনস্টিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ঐ স্কুলের তৎকালীন শিক্ষক কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মাথরুন স্কুলের ছাত্র নজরুল সম্পর্কে লিখেছেন:

> আমি ২৩ বৎসর বয়সে মাথরুন ইংরেজি স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি।... তখনকার দিনে ষষ্ঠ শ্রেণিতে নজরুল পড়িত। ছোট সুন্দর ছনছনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৩
৫. প্রাগুক্ত

তাহাকে আদর করিতাম। সে বড় লাজুক ছিল, হেড মাস্টারকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দেখিত... শিশুকালেই তাহার ব্যবহার ও কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ক্লাসের ছেলেরাও সকলে তাহাকে ভালবাসিত। সে স্কুলে বেশীদিন ছিল না, বোধ হয় ষষ্ঠ শ্রেণিতে উঠার আগে কি পরে অন্যত্র যায়।[৬]

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নজরল মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার পর পুনরায় স্কুলে যাওয়া বন্ধ করেন, সম্ভবত আর্থিক কারণেই। আবার নজরুলের ভবঘুরে জীবন শুরু হয়। এ সময়েই তিনি বাসুদেবের কবিদলের জন্যে গান, পালা ইত্যাদি রচনা এবং কখনো ঢোল বাজিয়ে আসরে গান করতেন। কবি বাসুদেবের মহড়ায় নজরুলের গান শুনে বর্ধমানের আন্ডার ব্রাঞ্চ রেলওয়ের একজন খ্রিষ্টান গার্ড তাঁকে পছন্দ করেন এবং একটা চাকুরি দেন। নজরুলের কাজ ছিল রেলস্টেশন থেকে প্রসাদপুর বাংলোয় দেড়মাইল কাঁচা পথ গার্ড সাহেবকে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রসাদপুর থেকে টিফিন ক্যারিয়ারে করে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে আসা। এছাড়া মাঝে মাঝে আসানসোল থেকে ট্রেনে করে গার্ড সাহেবের জন্য বিদেশি পানীয় কিনে আনা আর গান শোনানো।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গ্রন্থে লিখেছেন গার্ড সাহেবের চাকুরিকালে নজরুলের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। গার্ড সাহেব জংশন স্টেশনে নিয়মিত আর এক সাহেবের বাড়ি যেতেন পানীয় নিয়ে, সাহেব আর তার স্ত্রী পান করতেন সামান্যই কিন্তু গার্ড সাহেব খেতেন প্রচুর। এই সাহেবের স্ত্রীর প্রথম স্বামীর ঔরসজাত একটি খোঁড়া মেয়ে ছিল, ইতিমধ্যে মেয়েটির বাবা তাকে দাবি করে বসল, উদ্দেশ্য কিছু টাকার বিনিময়ে কারো কাছে বিয়ে দেওয়া। ওরা প্রমাদ গুণলেন এবং গার্ড সাহেবের পরামর্শ মতো মেয়েটিকে নজরুলের সঙ্গে তার প্রসাদপুরের বাংলোয় পাঠিয়ে দিলেন। মেয়ের বাবাকে তারা জানিয়ে দিলেন যে মেয়েটি ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড সাহেবের মুসলমান 'বয়ের' সঙ্গে পালিয়েছে। এ কাণ্ডের পরেই গার্ড সাহেবের মুসলমান বয়ের সঙ্গে নজরুলকে পঁচিশ টাকা হিসাবে দু'মাসের মাইনে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিদায় দেন। নজরুল আর কোনোদিন প্রসাদপুরের বাংলোয় ফিরে যাননি। নজরুলের খানসামা চাকুরির ইতি

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭

এখানেই। লক্ষ্যণীয় যে, নজরুলকে এ কাজ করতে গিয়ে কীভাবে অযথা দুর্নামের ভাগী হতে হয়েছিল। ঐ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ভাগ্য ছেলেবেলা থেকেই নজরুলের প্রতি বিরূপ। কিন্তু প্রতিকূল ভাগ্য বালক নজরুলকে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তাই নজরুলকে তারপর চাকুরি নিতে হয় আসানসোলে এক চা-রুটির দোকানে, সম্ভবত ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে। দোকানের মালিক হুগলী জেলার এম. বখশ নজরুলের মাসিক বেতন এক টাকা এবং আহারের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু থাকার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। নজরুল রাত্রিযাপন করতেন দোকান সংলগ্ন তিনতলা বাড়ির সিঁড়ির নিচে। ঐ বাড়িটি ছিল পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহর আবাস, রফিজউল্লাহ সাহেবের বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার কাজীর শিমলা গ্রামে। কাজী সাহেব সিঁড়ির নিচে ঘুমন্ত নজরুলকে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে নজরুলের জীবনের কাহিনি জানতে পারেন। তিনি নজরুলকে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে তাঁর বাড়ির কাজে নিযুক্ত করেন। কাজী রফিজউল্লাহ এবং তাঁর স্ত্রী শামসুন্নেসা তখন পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন, নজরুল তাঁদের অনুরোধ করেন তাঁর লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিতে। কাজী সাহেব নজরুলের পড়াশুনার ব্যবস্থার জন্যে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কাজী সাখাওয়াত উল্লাহ সাহেবকে পত্র দিয়ে নজরুলকে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। এভাবে নজরুলের আসানসোলে চা-রুটির দোকান এবং কাজী রফিজউল্লাহ সাহেবের বাড়ির তিন মাসের চাকুরির কাজ শেষ হয়।

মাথরুন স্কুল ছাড়ার দুই বছর পরে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল রফিজউল্লাহ্ সাহেবের গ্রামে গিয়ে নিকটবর্তী দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। নজরুল প্রথমে কাজীর শিমলা গ্রামে কাজী সাহেবদের বাড়িতে জায়গীর থাকতেন, পরে স্কুলের কাছাকাছি আরো দু'এক জায়গায় জায়গীর থেকেছেন। তিনি দরিরামপুর স্কুলে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেয়েছিলেন। ঐ স্কুলেরই একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে নজরুল রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' এবং 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতা দুটি আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। কাজীর শিমলা গ্রামে থাকার সময় নজরুলকে প্রতি দিন পাঁচ মাইল পথ হেঁটে দরিরামপুর স্কুলে যেতে হতো। ঐ গ্রামে বা স্কুলে নজরুলের বিশেষ কোনো বন্ধু-বান্ধব ছিল না। বরং সুযোগ পেলেই গ্রামের বখাটে

ছেলেরা তাঁকে জ্বালাতন করত। নজরুলকে মাঝে মাঝে নিকটবর্তী ঠুনি ভাঙা বিলের তীরে একটা গাছের নিচে বসে বাঁশি বাজাতে দেখা যেত। নজরুল লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন।

পরবর্তীতে নজরুল দেশে ফিরে গিয়ে এক বন্ধুর মাধ্যমে রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ স্কুলে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বন্ধুটি নজরুলকে ভর্তির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হলে নজরুল তাকে একটি পত্র লেখেন। নজরুলের বন্ধু ঐ পত্রটি স্কুলের হেডমাস্টারকে দেখালে তিনি পত্রের ভাষা ও মান দেখে বেশ কয়েকটি সুবিধাসহ নজরুলকে সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন। নজরুল সম্ভবত মাথরুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে, দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে আর সিয়ারসোল রাজ স্কুলে অষ্টম থেকে দশম শ্রেণিতে ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের প্রায় শেষ অবধি অর্থাৎ সেনাবাহিনীতে যোগদান পর্যন্ত ছিলেন। সিয়ারসোল স্কুলে ভর্তির আগে নজরুল বর্ধমান নিউ স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলেন। নজরুল যে তিন বছর সিয়ারসোল স্কুলে পড়েছিলেন তখন তাঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল 'মোহামেডান বোডিং'-এ। একটি মাটির ঘরে বোর্ডিংটি অবস্থিত ছিল, আরো চারজন মুসলমান ছাত্রের সঙ্গে নজরুল সেখানে থাকতেন। নজরুলকে স্কুলের বেতন বা বোডিং-এ থাকা-খাওয়ার খরচ দিতে হতো না। রাজবাড়ি থেকে হাত খরচের জন্যে সাত টাকা বৃত্তিও পেয়েছিলেন নজরুল। অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সিয়ারসোল স্কুলে ছাত্র হিসেবে নজরুল কেমন ছিলেন, সে সাক্ষ্য দিচ্ছেন তাঁর তখনকার জীবনের বন্ধু শৈলজানন্দ, তাঁর 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গ্রন্থে:

> 'স্কলারশিপ পাবার মত ছেলে নজরুল। প্রতি বৎসর ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়। হ্যাঁ খুব ভাল ছেলে, ডবল প্রমোশন পেয়ে দুটো ক্লাস ডিংগিয়ে একেবারে সেকেন্ড ক্লাসে চলে এসেছে।[৭]

এই সিয়ারসোল স্কুলে পড়ার সময় সন্ত্রাসবাদী 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক বিপ্লববাদে নজরুলকে প্রভাবিত করেন। পরবর্তী জীবনে বিপ্লবীদের প্রতি নজরুলের যে আকর্ষণ তার সূত্রপাত এখান থেকেই। নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাসের বিপ্লবী স্কুল শিক্ষক প্রমত্ত চরিত্রে নিবারণচন্দ্র ঘটকের ছায়া পড়েছে:

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-২২

এমনি দিনে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী' মন্ত্রে এই কল্পনাপ্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক স্কুল মাষ্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লবী।[৮]

সিয়ারসোল স্কুলে শুধু বিপ্লববাদে দীক্ষা নয়, কবিতা রচনারও সুযোগ আসে নজরুলের। ঐ স্কুলে পড়ার সময় তিনজন শিক্ষক স্কুল ছেড়ে চলে যান এবং প্রতিবারই তাঁদের কবিতায় লেখা বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হয়, যেগুলি ছিল নজরুলের রচনা।

নজরুলের সিয়ারসোল স্কুল জীবনের বন্ধু ছিলেন তিনজন– শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ এবং আবদুল জব্বার।

নজরুলের সিয়ারসোল স্কুল জীবনে কবিতা লেখার বিবরণ দিয়েছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তাঁর 'আমার বন্ধু নজরুল' গ্রন্থে:

> নজরুল কবিতা লিখতে লাগলো। তার চুরুলিয়া গ্রামের বাড়ীর সামনে প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢিবি আছে যা অনেক দিনের পুরনো। সেই মাটির ঢিবিটাকে নিয়েই নজরুল রচনা করেছিল তার প্রথম কবিতা। একটি কবিতার নাম দিয়েছিল 'রাজার গড়'। আর একটির নাম দিয়েছিল 'রাণীর গড়'। এই কবিতা দুটি আমাকে সে পড়তে দিয়েছিল। নজরুলের নিজের হাতের লেখা। নীচে তারিখ পর্যন্ত দেওয়া আছে ১২.৪.১৭। অর্থাৎ ১৯১৭ সালের বারোই এপ্রিল। নজরুলের বয়স তখন বোধ করি আঠারো পেরিয়েছে।[৯]

'রাজার গড়' কবিতায় একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ বালক নজরুলের মনে যে ভাবনার সৃষ্টি করত তা ধরা পড়েছে।

একইভাবে 'রাণীর গড়' কবিতায় নজরুল রাণীগঞ্জের নিসর্গ রহস্য অঙ্কন এবং শহরের নাম-মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

নজরুলের সিয়ারসোল স্কুল জীবনে রচিত আর একটি কবিতা 'চড়ুই পাখির ছানা'। একই গ্রন্থে শৈলজানন্দ জানাচ্ছেন, কবিতাটি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লেখা। এক দালান বাড়ির উঁই-লাগা কড়ির ফাঁকে চড়ুই পাখির বাসা থেকে একটি চড়ুই ছানা নিচে পড়ে গিয়েছিল, তার আকুল কান্নায় বালক নজরুলের দরদি মন

---

৮. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-৩য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২৭২

৯. রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, ২০১২, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ.-২৫

কেঁদে উঠেছিল আর সে ছানাটিকে তার বাসায় তুলে দিয়েছিল। চড়ুই ছানার দুঃখে কাতর নজরুলের হৃদয় নজরুল চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় বহন করে।

১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে নজরুল যখন দশম শ্রেণির ছাত্র, 'প্রি-টেস্ট' পরীক্ষা চলছে, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ আর জার্মানির যুদ্ধের ঢেউ বাংলাদেশে এসে লাগল। ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী তখন মিত্রশক্তির পক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন প্রদেশের রেজিমেন্ট ছিল, ছিল না কেবল বাংলাদেশের অর্থাৎ বাঙালি সেনাদের নিয়ে গঠিত কোনো দল। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ বাঙালি সিপাহিদের মধ্যে শুরু হয়েছিল বলে ঐ ব্যবস্থা ।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গ্রন্থে লিখেছেন,

> বাংলাদেশ থেকে বাঙালি পল্টনের দাবী উঠল, বৃটিশ সরকার রাজনৈতিক কারণে বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে ভর্তির ব্যাপারে উৎসাহী না থাকলেও গণদাবীর ফলে তার নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। গঠিত হয় বাঙালী পল্টন, আর সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শহরে গ্রামে সর্বত্র পোস্টার দেওয়া হয়:
>
> 'কে বলে বাঙালি যোদ্ধা নয়! কে বলে বাঙালি ভীতু! জাতির এই কলঙ্ক মোচন করা একান্ত কর্তব্য, আর তা পারে একমাত্র বাংলার যুব শক্তি। ঝাঁপিয়ে পড় সিংহ বিক্রমে। বাঙালি পল্টনে যোগ দাও।'[১০]

নজরুল বাঙালি পল্টনে যোগদান করলেন। বাঙালি পল্টনের সৈনিকদের প্রশিক্ষণের জন্য নওশেরা বা করাচি নিয়ে যাওয়ার পূর্বে কলকাতায় যে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তা নজরুলের হৃদয়ে কী রকম দাগ কেটেছিল এবং কোন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় 'রিক্তের বেদন' থেকে:

> আঃ একি অভাবনীয় নতুন দৃশ্য দেখলুম আজ! জননী জন্মভূমির মঙ্গলের জন্য সে কোন অদেখা দেশের আগুনে প্রাণ আহুতি দিতে একি অগাধ অসীম উৎসাহ নিয়ে ছুটছে তরুণ বাঙালিরা, আমার ভাইরা! খাকি পোষাকের ম্লান

---

১০. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭

আবরণে এ কোন আগুন ভরা প্রাণ চাপা রয়েছে। তাদের গলায় লাখো হাজার ফুলের মালা দোল খাচ্ছে, ওগুলো আমাদের মায়ের দেওয়া ভাবী বিজয়ের আশীস মালা, বোনের দেওয়া স্নেহ বিজড়িত অশ্রুর গৌরবোজ্জ্বল কমহার।[১১]

'রিক্তের বেদনে'র মধ্য দিয়ে যুদ্ধে যোগদান এবং যাত্রাকালীন তরুণ নজরুলের মনোভাব ফুটে উঠেছে। তবে সৈনিক হবার পেছনে যে তার চরিত্রের খেয়ালিপনাও কাজ করেনি তা বলা যায় না, অন্যথায় 'ব্যথার দান' গ্রন্থের 'হেনা' গল্পের নায়ক কেন বলবে:

'তবু আমি সরল মনে বলছি, ইংরেজ আমার শত্রু নয়। এ আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। যদি বলি আমার এ যুদ্ধে আসার কারণ, একটা দুর্বলকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ আহুতি দেওয়া তাহলেও ঠিক উত্তর হয় না। আমার অনেক খামখেয়ালীর অর্থ আমি নিজেই বুঝি না'।[১২]

শৈলজানন্দ তাঁর 'আমার বন্ধু নজরুল' গ্রন্থে নজরুলের সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার যে কারণ নির্দেশ করেছেন তা হলো– 'নজরুলের জীবনের নিগূঢ়তম বেদনা। যার সঙ্গে মিশেছিল কৈশোরের দুর্দমনীয় অ্যাডভেঞ্চার প্রীতি'। তাই সব কিছু হাসিমুখে ত্যাগ করে সে ঝাঁপ দিয়েছিল মরণ যজ্ঞে। এভাবেই সমাপ্ত হয়েছিল নজরুলের বিঘ্নিত ছাত্রজীবন। নজরুল ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসের পর কোনো এক সময় ৪ বেঙ্গলি রেজিমেন্টে রিক্রুট হয়ে করাচিতে যান এবং ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত সেখানে সাময়িক জীবনযাপন করেন।[১৩]

নজরুলের সৈনিক জীবন করাচি যাওয়া বা যুদ্ধ করার জন্যে ফলপ্রসূ হয়নি বরং তা গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সাধনার জন্যে, নজরুলের সাহিত্যিক জীবনের শুরু যেন সৈনিক জীবনের শুরু থেকেই। সামরিক জীবন নজরুলকে স্থিরভাবে কাব্য ও জ্ঞানচর্চার সুযোগ এনে দেয়। অনুবাদ কাব্য রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন:

আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি সেটি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়। আমাদের বাঙালি পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতক

---

১১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২৩৩

১২. রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ.-২৮

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩০

গুলি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। শুনে আমি এমন মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সেইদিন থেকে তাঁর কাছে ফার্সি শিখতে আরম্ভ করি। তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্তকাব্যই পড়ে ফেলি।[১৪]

এ থেকে বোঝা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যে দৈহিক ভাবে না গেলেও পারস্যে নজরুলের মানস ভ্রমণ সম্পন্ন হয়েছিল করাচি সেনানিবাসে ফার্সি কাব্য পাঠের মাধমে। করাচির সেনানিবাসে নজরুলের সাহিত্যচর্চা কেবল মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্য আশ্রিতই ছিল না, কলকাতার সাহিত্য জগতের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি কলকাতার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকাগুলির গ্রাহক ছিলেন। করাচিতে নজরুল সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করেন এবং কলকাতার পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশের জন্যে প্রেরণ করেন। তাঁর রচনাবলি কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়।

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে ৪৯ নং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হলে নজরুল করাচি থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় নজরুল ওঠেন বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দের রমাকান্ত বোস স্ট্রিট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের বোর্ডিং-এ। শৈলজানন্দের অতিথি হয়ে ঐ বোর্ডিং-এ নজরুলকে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। নজরুল মুসলমান জেনে মেসের চাকর ওর এঁটো বাসন ধুতে অস্বীকার করে এবং শৈলজানন্দকে তা পরিষ্কার করতে হয়। ফলে নজরুলকে নিয়ে তিনি ঐ মেস ছেড়ে দেন। নজরুলের জীবনে এমন ব্যাপার আরো দু'বার ঘটেছিল, একবার হেমেন্দ্র কুমার কন্যার বিবাহ উৎসবে আর একবার নলিনাক্ষ সান্যালের বিবাহে। উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহ আসরে নজরুল মুসলমান বিধায় তাঁর উপস্থিতি আসরে ঝড় তুলেছিল।[১৫]

শৈলজানন্দের মেস ছেড়ে নজরুল ৩২নং কলেজ স্ট্রিটে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিসে এসে ওঠেন এবং মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে একই ঘরে বসবাস করতে শুরু করেন। এই বাড়িতেই মোসলেম পাবলিশিং হাউসের অন্যতম মালিক আফজালুল হক এবং কাজী আবদুল ওদুদ বাস করতেন। নজরুল যখন ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে থাকতে শুরু করেন তখন তাঁর সম্পত্তির মধ্যে ছিল সৈনিকের পোশাক, শেরওয়ানি, ট্রাউজার্স, কালো উঁচু টুপি, বাইনোকুলার, কবিতা ও গানের খাতা, পুথি-পুস্তক, মাসিক পত্রিকা, রবীন্দ্র সংগীতের স্বরলিপি এবং উর্দু

---

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৪

অনুবাদসহ একটি দিওয়ানে হাফিজ। নজরুল চুরুলিয়া থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পথে বর্ধমানের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে সাব-রেজিস্ট্রার পদের জন্যে দরখাস্ত দিয়ে আসেন, প্রাক্তন সৈনিকেরা তখন ঐ ধরনের চাকুরির ব্যাপারে সুবিধা পেত। নজরুল চাকুরির জন্যে সাক্ষাতকারের চিঠি পেয়েছিলেন কিন্তু মুজফ্ফর আহমদ, আফজালুল হক প্রমুখ বন্ধুর পরামর্শে ইন্টারভিউ দিতে যাননি। আফজালুল হক তখন তাঁর পিতা শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় 'মোসলেম ভারত' নামক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশের আয়োজন করছিলেন আর সে সময়ই নজরুলের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। আফ্জালুল হক 'মোসলেম ভারত' প্রথম সংখ্যার জন্যেই নজরুলের লেখা চাইলেন, নজরুলের একটি পত্রোপন্যাসের কিছুটা অংশ করাচিতে রচিত ছিল, নাম তখনও ঠিক স্থির হয়নি, নজরুল 'তহমিনা' বা 'বাঁধন-হারা' যে কোনো একটি নাম দেবেন ভেবেছিলেন। সকলের পছন্দ অনুসারে 'বাঁধন-হারা'ই স্থির হয়। তবে 'তহমিনা' নামটি নজরুল 'কুহেলিকা' উপন্যাসে ব্যবহার করেছিলেন।[১৬]

নজরুলের পত্রোপন্যাস 'বাঁধন-হারা' মাসিক 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় ১৩২৭ সালের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত আটটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বাঁধন-হারা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ছয় বছর পরে ১৩৩১ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯২৭ খ্রি.) 'বাঁধন-হারা' 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৭ ভাদ্র সংখ্যায় 'নিকষমণি' স্তবকে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল:

> বাঁধনহারা বড় উপভোগ্য। তাহাতে বিবাহতত্ত্ব বড় সরস– অবিবাহিত দ্বিপদ বিবাহিত চতুষ্পদ, মাঝখানে মায়ের স্নেহাশ্রুমাখা আদরের চিঠিখানি বেশ। তাহার পর করাচির বর্ণনাটিতে যৌবন জলতরঙ্গ আছে– উপমাগুলি মন-মাতানো।[১৭]

'বাঁধন-হারা'র সম্পর্কে 'নারায়ণ' পত্রিকার ১৩২৭ সংখ্যায় লেখা হয়:

> হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের সেই অনুপম বাঁধনহারা। নজরুল অরূপ রসের কবি তাহা আমি জানিতাম, এবারকার (ভাদ্র) বাঁধনহারার গোড়ায়

---

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৬
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৭

তাহাকে পাই বাঘের মত কেমন যেন সুন্দর তবু ভয়ঙ্কর ... কোয়ার্টার গার্ডের হাবিলদারের ছবিটি আঁকিতে রং কোথাও বেশি পড়ে নাই। তারপর আবার সেইরূপ অপরূপের রস। এই রসে নজরুল যেমন ফোটে তেমন আর কোথাও নয়।[১৮]

'নারায়ণ' পত্রিকার পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন প্রাক্তন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'বাঁধন-হারা'র প্রশংসা প্রকাশিত হলে, কবিতার ভাষায় বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে একটি পত্র দেন। এই কবিতাটিই পরে 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের উৎসর্গ পত্র হয়েছিল।[১৯]

ভাঙা বাঙ্‌লার আদি-যুগের আদি পুরোহিত সাগ্নিক বীর
শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ
শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু
অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমার শুধু সাজে।
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে॥
[...] [...]

তোমার অগ্নি-পূজারী
স্নেহ-মহিমান্বিত শিষ্য– কাজী নজরুল ইসলাম

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় পত্রটি বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে পৌঁছে দেন এবং কিছু দিন পরে নজরুল 'বিজলী' অফিসে গিয়ে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে দেখা করেন। 'বিজলী' অফিসে নজরুলের আরো পরিচয় হয় নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে, ঐ পত্রিকার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নজরুলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের কথা লিখতে গিয়ে নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন:

'নজরুল ইসলাম মানুষটিকে সেদিন খুবই ভালো লাগলো। প্রাণ খোলা হাসি, মন খোলা কথা, দিল খোলা মানুষ।... তার সান্নিধ্যে এসে কিন্তু নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম এই স্বচ্ছ,স্পষ্ট, নির্ভীক মানুষটির জন্যে'।[২০]

নজরুল ও নলিনীকান্ত সরকার তাঁদের পরিচয় উদ্‌যাপন করেছিলেন গানের মধ্য দিয়ে। তাদের সখ্য ও বন্ধুত্ব গভীর এবং স্থায়ী হয়েছিল। নজরুল তাঁর কলকাতা জীবনের শুরুতে কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই খ্যাতি অর্জন করেননি,

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪৮
১৯. প্রাগুক্ত
২০. প্রাগুক্ত

একজন সুগায়ক হিসেবেও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান কেরানি এবং ছাত্রদের বিভিন্ন মেস ও হোস্টেলের গানের আসরে প্রায়ই আমন্ত্রিত হতেন এবং যোগ দিতেন। অনেক হিন্দু পরিবারেও তিনি গান করেছেন। এ সময়ে রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়। নজরুল সেকালে হিন্দুস্থানি গানও করতেন, বিশেষ করে অবাঙালি শ্রোতাদের জন্য। এভাবে নজরুল তাঁর কলকাতা জীবনে প্রথম বছরেই কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশকালে কাজের সুবিধার জন্যে সাহিত্য সমিতির বাড়ি ছেড়ে মার্কুইস লেনে এক বাড়িতে কিছুদিন এবং পরে প্রথমে ৬ টার্নার স্ট্রিটে (তখন তামরুলিলেন) বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটের মতো (সাহিত্য সমিতির অফিস) টার্নার স্ট্রিটের বাড়ি ও কবি সাহিত্যিদের আগমনে সরগরম থাকত। কবি মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন এই বাড়ির নিত্য অভ্যাগতদের একজন। তিনি তখন লেবুতলার ক্যালকাটা হাই স্কুলের একজন শিক্ষক। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের শেষ দিকে একদিন সন্ধ্যার পর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুল আমহার্স্ট স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। প্রথম পরিচয়েই তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। যেসব সাহিত্যিককে মোহিতলাল পছন্দ করতেন না, তাঁদের সম্পর্কে তিনি নজরুলকে সতর্ক করে দেন। তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রতি কোনো কারণে বিরূপ ছিলেন, সেজন্যে নজরুলের কাছ থেকে 'প্রবাসীতে না লেখার কথা আদায় করে নিয়েছিলেন। মোহিতলালের সঙ্গে যতদিন সুসম্পর্ক ছিল ততদিন নজরুল প্রবাসীতে লেখেননি। পরিচয়ের পর থেকে মোহিতলাল টার্নার স্ট্রিটের বাড়িতে স্কুল ছুটির পর বিকালের দিকে নিয়মিত আসতেন এবং দীর্ঘ সময় নজরুলের সঙ্গে কাটাতেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো, বিশেষত সংস্কৃত কাব্য ও ছন্দ বা ইংরেজি কবিতা নিয়ে। কখনো কখনো তিনি নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন। মাঝে মাঝে তাঁরা ৩২ নং কলেজ স্ট্রিটে সাহিত্য সমিতির অফিসে বা কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সাহিত্যিক আড্ডায়ও যেতেন।

এ সময়ে কলকাতায় সাহিত্যিকদের দুটি বিখ্যাত আড্ডা ছিল। একটি 'ভারতী' কার্যালয়ে 'ভারতীর আড্ডা'; এখানে আসতেন অতুলপ্রসাদ সেন, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির ভাদুড়ী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ। অপর আড্ডাটি ছিল 'গজেনদার আড্ডা'; এখানে আসতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ওস্তাদ করমতুল্লাহ খাঁ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, ধূর্জটিপ্রসাদ প্রমুখ। ঐ দুটি আড্ডাতেই নজরুলের যাতায়াত ছিল। সেসব আসরে নজরুলের চিত্র এঁকেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়:

> "নজরুল আসতে লাগলেন প্রত্যহ এবং দু'দিন না যেতেই বোঝা গেল ছেলেটি লাজুক নয় আদৌ। ঝড়ের মত ঘরে ঢুকেই সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে' কোন দিকে দৃকপাত না করে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করেন টেবিল হারমোনিয়ামটাকে, তারপর মাথার ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাইতে থাকেন গানের পর গান। কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের ওপরের ঘর, রাস্তায় জমে যেত জনতা। অনেক বড় বড় গায়ক সে ঘরে এসে গান গেয়েছেন, তবু তাঁদের গান শোনার জন্য অত লোক দাঁড়িয়ে যেত না। কিন্তু নজরুলের গানের ভিতরে নিশ্চয়ই ছিল কোন বিশেষ আকর্ষণীয় শক্তি।[২১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের প্রথম কখন দেখা হয় তা সঠিক জানা যায়নি। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস থেকে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত প্রায় চোদ্দো মাস রবীন্দ্রনাথ ইউরোপে ছিলেন। ইউরোপ থেকে ফিরে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন কলকাতায় অতিবাহিত করেন। ঐ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম দেখা হয়। সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের বর্ণনা থেকে মনে হয় কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের প্রথম দেখা হয়:

> জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসার সময় তেমন বড় লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি, অতি বাকপটুকেও ঢোক গিলে

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৭

কথা বলতে শুনেছি, কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, তোর ঐ সব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকের বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনিভাবে কথা কইতে। নজরুল প্রমাণ করে দিলেন যে সে তা পারে। তাই একদিন সকালবেলা 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে সে কবির ঘরে গিয়ে উঠল, কিন্তু তাকে জানতেন বলে কবি বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না।"[২২]

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতীয় উপমহাদেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে চঞ্চল হয়ে ওঠে। অসহযোগ ও খেলাফতের পটভূমিকায় মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। এ বিষয়ে সাহায্যের জন্যে তাঁরা কংগ্রেস ও খেলাফত নেতা এবং কলকাতা হাইকোর্টের উকিল এ.কে. ফজলুল হকের শরণাপন্ন হন। হক সাহেবেরও বহুদিন থেকে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, তিনি এ ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহ এবং সাহায্যের আশ্বাস দেন। ফজলুল হক সাহেবের একটি ইংরেজি প্রেসে বাংলা টাইপ কিনে কাগজ ছাপাবার ব্যবস্থা করা হয়। পত্রিকার নাম 'নবযুগ', পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এ.কে. ফজলুল হক, তবে মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুল ইসলাম হলেন প্রকৃত বা যুগ্ম সম্পাদক। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ই জুলাই 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'নবযুগ' বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

'নবযুগ' পত্রিকায় বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে নজরুলের সমাজ ও যুগসচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমসাময়িক দেশ ও বিদেশের ঘটনাবলি নজরুলের পর্যালোচনায় সঠিকভাবে ফুটে ওঠে। 'নবযুগে' একটি লেখায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তরকালীন জাগরণের চিত্র নজরুল অংকন করেছিলেন:

রুশিয়া বলিল, "মারো অত্যাচারীকে! ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই খোদকারী শক্তিকে দলিত কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন কর"।... "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তুর্কী সাড়া দিল। তাহার শূন্য নতশিরে আবার অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৫৮

রাগ স্বাধীনতা পন্থীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। আইরিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানব শক্তির বজ্রমুঠি আমাদের টুটি টিপিয়ে ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দি"। এমন সময় ভারত জাগিল।"[২৩]

শুধু বিদেশি সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশবাদের অন্যায়, অত্যাচার, শাসন, শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেই নয়– পুঁজিবাদী, সামন্ত, মহাজন ও আমলা শাসন, জুলুম ও শোষণের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার ছিলেন। তাঁর সহানুভূতি ছিল সর্বহারা কৃষক ও শ্রমিকের প্রতি।

বিশের দশকে একদিকে কৃষক ও শ্রমিকের অর্থাৎ শোষিতের, অপরদিকে মহাজন, কোম্পানি, আমলা অর্থাৎ শোষকের শোষণ এবং সর্বহারার সংগ্রামের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। নজরুলের পূর্বে বাংলাদেশে শ্রেণি সংগ্রামের এবং আমলাতন্ত্রের স্বরূপ এতটা সচেতনভাবে আর কেউ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন কিনা সন্দেহ।

নজরুলের জীবনে এক বেদনা বিধুর অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল কুমিল্লা জেলার দৌলতপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে।

কাজী নজরুল ইসলাম এক বৈশাখের শুরুতে আলী আকবর খানের সঙ্গে তাঁর দৌলতপুর গ্রামের বাড়িতে যান। এখানেই আলী আকবর খানের ভাগ্নী সৈয়দা খাতুনের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা হয়ে যায়। ১৩২৮ সালের বৈশাখ মাসে দৌলতপুরে রচিত 'হারমানা হার' কবিতায় দেখি ঘরের মায়া কবিকে মুগ্ধ করেছে। এ কবিতাটি 'ছায়ানট' গ্রন্থে সংকলিত:

তোরা কোথা হতে কেমনে এসে
মণি-মালার মত আমার কণ্ঠে জড়ালি
আমার পথিক-জীবন এমন ক'রে
ঘরের মায়ায় মুগ্ধ করে বাঁধন পরালি।[২৪]

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-৬৫-৬৬
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-৭৪

দৌলতপুরে জ্যৈষ্ঠ মাসে রচিত এবং 'ছায়ানটে' সংকলিত অপর একটি কবিতা 'মানস-বধূ'। এ কবিতায় কবির বেদনার ছাপ পড়েছে, কিন্তু তার মধ্য থেকে এক বধূর মূর্তি স্পষ্ট:

সে যেন কোন দূরের মেয়ে আমার কবি মানস বধূ,
বুক-পোড়া আর মুখ ভরা তার পিছলে পড়ে ব্যথার মধু।
নিশীথ-রাতের স্বপন হেন,
পেয়েও তারে পাইনে যেন,
মিলন মোদের স্বপন-কূলে কাঁদন-ভরা চুমায় চুমায়।
নাম-হারা সেই আমার প্রিয়, তারেই চেয়ে
জনম গোয়ায়।[২৫]

দৌলতপুরে সৈয়দা খাতুনের সঙ্গে নজরুলের ঘনিষ্ঠতা এবং আলী আকবর খানের উদ্যোগে তাঁদের মধ্যে বিবাহ স্থির হয়। নজরুল তাঁর বিবাহ ঠিক হওয়ার কথা কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের লিখে জানান, আমন্ত্রণ পত্রও যথাসময়ে কলকাতায় শুভার্থীদের কাছে পৌঁছে যায়। কলকাতার সাহিত্যিক বন্ধুরা এ সংবাদে অবাক হলেও শুভ কামনা জানিয়ে নজরুলকে উত্তর দেন।

> যখন আজ তোর চিঠিতে জানলুম যে, তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাঁকে বরণ ক'রে নিয়েছিস, তখন আমার অবশ্য কোন দুঃখ নেই। তবে একটা কথা, তোর বয়েস আমাদের চেয়ে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ, ফিলিংস এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশী। কাজেই ভয় হয় যে, হয়ত বা দু'টো জীবনই ব্যর্থ হয়।[২৬]

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চিঠিতে একটা আশঙ্কার প্রকাশ ছিল, 'দুটো জীবনের ব্যর্থতার সম্ভাবনা'। তবে পবিত্র বাবুকে লেখা ঐ পত্রে নজরুলের একটা উদ্ধৃতি পাওয়া যায় যা থেকে দৌলতপুরে সৈয়দা খাতুন সম্পর্কে নজরুলের মনোভাব স্পষ্ট:

> "যাঁকে পেয়েছিস তিনিই যে তোর 'চিরজনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী' একথা সত্যি যদি এতটুকু সত্য হয়, তাহলে তোর সৌভাগ্যে আমার সত্যই ঈর্ষা হচ্ছে। লিখেছিস, 'এক অচেনা পল্লী বালিকার কাছে এত বিব্রত আর

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৭৫
২৬. প্রাগুক্ত

অসাবধান হয়ে পড়েছি, যা কোন নারীর কাছে কখনও হইনি'। জেনে খুশীই হলাম যে, তার বাইরের ঐশ্বর্যও যথেষ্টই আছে।"[২৭]

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখা পত্রে নজরুলের যে স্বীকারোক্তি তাতে মনে হয় পল্লী বালিকা সৈয়দা খাতুন নজরুলকে যথেষ্ট আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'বাইরের ঐশ্বর্য' কথাটায় বোঝা যায়, নজরুল সৈয়দা খাতুনের রূপ ও সৌন্দর্যে যথেষ্ট মুগ্ধ ও বিহ্বল হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

বিবাহের তারিখ ঠিক হয়েছিল ৩রা আষাঢ়, ১৩২৮ সাল। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে যে নিমন্ত্রণ পত্রটি ছাপানো হয়েছিল সেখানে কনের মামা আলী আকবর খান 'অপূর্ব নিমন্ত্রণ পত্রের' উপসংহারে লিখেছিলেন, 'বিয়ের দিন আগামী ৩রা আষাঢ়, শুক্রবার নিশীথ রাতে। নিশীথ রাতের বাদল ধারার মতোই আপনাদের সকলের মঙ্গল আশিস যেন এদের শিরে ঝরে পড়ে এদিন। ভাগ্যের পরিক্রমায় সেই নিশীথ রাতের বাদল ধারা মাথায় করে নজরুলকে চিরদিনের জন্য নার্গিসকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল। কাবিন নামায় 'ঘরজামাই' করার শর্ত থাকলে নজরুলের আত্মমর্যাদায় লাগে এবং বিয়ের আসর থেকে তিনি উঠে গিয়েছিলেন, আর সেই রাতেই দৌলতপুর ছেড়ে পায়ে হেঁটে কুমিল্লা চলে গিয়েছিলেন, আর কোনোদিন তিনি নার্গিসকে গ্রহণ করেননি। এভাবেই বিয়ের রাতে 'শাহনজর' বা 'বাসর'-এর পরিবর্তে নজরুলকে বর্ষার রাত পথে কাটাতে হয়েছিল। নজরুল দৌলতপুর থেকে কুমিল্লায় গিয়ে বিরজাসুন্দরী দেবীর আশ্রয়ে ছিলেন। স্মরণীয় যে, দৌলতপুর যাবার এবং দৌলতপুর থেকে ফেরার পথে নজরুল কুমিল্লায় যে পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, সে পরিবারের সঙ্গেই তাঁকে বন্ধনে গ্রথিত হতে হয়েছিল তিন বছর পরে আশালতা ওরফে প্রমীলার পাণিগ্রহণ করে। দৌলতপুর ছাড়ার প্রায় পনেরো বছর পরে নজরুল নার্গিস খানমের এক পত্রের উত্তরে, কলকাতা ১০৬, আপার চিৎপুর রোডের গ্রামোফোন রিহার্সেল রুমে বসে ১-৭-৩৭ তারিখে নার্গিসকে যে চিঠি দেন তা থেকে তাঁদের পারস্পরিক অনুভূতি ও বক্তব্য সম্পর্কে একটা ধারণা স্পষ্ট হয়। নজরুল নার্গিসকে ছেড়ে এসেছিলেন এক বর্ষায় পনেরো-ষোলো বছর আগে, তাঁর পত্রের উত্তরে তাঁকে লিখেছেন আর এক বর্ষায়। চিঠিতে নজরুলের কোনো অভিযোগ বা অনুযোগ ছিল না নার্গিসের প্রতি, একটা ক্ষমা সুন্দর মনোভাব নিয়ে

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-৭৬

তিনি তাঁর পত্রের উত্তর দিয়েছিলেন। নজরুলের এ চিঠিতে যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যবান তা হলো, পনেরো বছর কোনো রকম সম্পর্ক বা যোগাযোগ না থাকলেও নার্গিসের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অসীম বেদনার অকপট স্বীকৃতি:

> 'আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি– তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমাণিক না দিলে আমি অগ্নি-বীণা বাজাতে পারতাম না– আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না।'[২৮]

নজরুলের ঐ 'কনফেশান' থেকে মনে হয় নার্গিসের সঙ্গে বিচ্ছেদের ফলে সৃষ্টি সৃষ্ট বেদনার সাগর থেকে উত্থিত হয়েছে আগুন যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে 'অগ্নি-বীণা' ও 'ধূমকেতুর' জ্বালা আর 'পূজারিণী'র বেদনা। তবে নজরুলের তো জন্ম হয়নি দৌলতপুরে বা ঢাকায় কোনো পুস্তক ব্যবসায়ীর 'ঘরজামাই' রূপে জীবন কাটানোর জন্যে? নজরুলের ঐ জীবন কল্পনাই করা যায় না। নজরুলের জীবন বিধাতা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন মহৎ কীর্তির জন্য। সাধারণ আটপৌরে ছাপোষা গতানুগতিক বা অধীন জীবন-যাপনের জন্যে নয়। নজরুল তাঁর চিঠিতে নার্গিসকে লিখেছিলেন 'তুমি এই আগুনের পরশমাণিক না দিলে অগ্নি-বীণা বাজাতে পারতাম না– আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না'। বাস্তবিক নজরুল দৌলতপুরের বেদনা বিধুর অধ্যায়ের পরেই তাঁর জীবনের কয়েকটি মহৎ সৃষ্টি 'কামাল পাশা', 'প্রলয়োল্লাস', 'ভাঙার গান' এবং 'কারার ঐ লৌহ কপাট' রচনা করেছিলেন।

এরপর নজরুলের জীবন বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত। বিপ্লবী নজরুল, সাম্যবাদী নজরুল। জীবনের বিভিন্ন ধাপ নজরুলের জীবনকে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করেছে, সেই সাথে সাথে বিক্ষিপ্ত মন নজরুলকে বিভিন্ন কিছু যেমন জানিয়েছেন, চিনিয়েছেন তেমনি জীবনকে মনকে আন্দোলিতও করেছেন।

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-৮৯

তথ্যনির্দেশ

১। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও সৃজন, ২০১২, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

২। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, মার্চ ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের গদ্যরচনা: সাধারণ পরিচিতি

প্রস্তাবিত গবেষণার প্রাথমিক উৎস ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত রচিত কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, অভিভাষণ ও চিঠিপত্রসমূহ। নিম্নে গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করা হলো:

উপন্যাসসমূহ:	প্রকাশ সাল
১. বাঁধন-হারা[১]	১৯২৭
২. মৃত্যুক্ষুধা[২]	১৯৩০
৩. কুহেলিকা[৩]	১৯৩১

নজরুলের ছোটগল্প:

গ্রন্থের নাম	অন্তর্ভুক্ত গল্পের নাম	প্রকাশকাল
১. ব্যথার দান[৪]	১. ব্যথার দান	১৯২২
	২. হেনা	
	৩. বাদল-বরিষণে	
	৪. ঘুমের ঘোরে	
	৫. অতৃপ্ত কামনা	
	৬. রাজবন্দীর চিঠি	
২. রিক্তের-বেদন[৫]	১. রিক্তের বেদন	১৯২৪
	২. মেহের-নেগার	
	৩. স্বামীহারা	

---

১. কাজী নজরুল ইসলাম, বাঁধন-হারা, ১৯২৭, সওগাত পত্রিকা।

২. কাজী নজরুল ইসলাম, মৃত্যুক্ষুধা, ১৩৩৭, বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ১৩৩৬ ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত সওগাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. কাজী নজরুল ইসলাম, কুহেলিকা, ১৩৩৫, মুয়াজ্জিন পত্রিকায় প্রকাশিত।

৪. কাজী নজরুল ইসলাম, ব্যথার দান, ১ম প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রকাশক এম. আফজালুল হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউজ, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা।

৫. কাজী নজরুল ইসলাম, রিক্তের-বেদন, ১৯৪০, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা।

	৪. রাক্ষুসী	
	৫. সালেক	
	৬. সাঁঝের তারা	
	৭. বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী	
	৮. দুরন্তপথিক	
৩. শিউলিমালা[৬]	১. শিউলিমালা	১৯৩১
	২. পদ্ম-গোখ্‌রো	
	৩. জিনের বাদশা	
	৪. অগ্নি-গিরি	

নজরুলের প্রবন্ধ[৭]:

গ্রন্থের নাম	অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধের নাম	প্রকাশকাল
১. যুগবাণী	১. নবযুগ	১৯২২
	২. গেছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ!	
	৩. ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ	
	৪. মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?	
	৫. লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলকাতার দৃশ্য	
	৬. ধর্মঘট	
	৭. ছুৎমার্গ	
২. দুর্দিনের যাত্রী	১. মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা	১৯২৬
	২. আমি সৈনিক	
	৩. আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল	

৬. কাজী নজরুল ইসলাম, শিউলিমালা, ১৩৩৮, ডি.এম লাইব্রেরী, কলিকাতা।

৭. প্রাগুক্ত, প্রবন্ধ, ১৩২৬, সওগাত, কলিকাতা।

৩. রুদ্রমঙ্গল	১. রুদ্রমঙ্গল	১৯২৭
	২. ধূমকেতুর পথ	
	৩. মন্দির ও মসজিদ	
	৪. হিন্দু-মুসলমান	

নজরুলের অভিভাষণ[৮]:

- প্রতিভাষণ
- তরুণের সাধনা
- বার্ধক্য ও যৌবন
- গোঁড়ামি ও কুসংস্কার
- অবরোধ ও স্ত্রী-শিক্ষা
- সঙ্ঘ একনিষ্ঠতা
- সঙ্গীতশিল্প
- হিন্দু-মুসলমান ঐক্য
- শেষকথা

প্রতি-নমস্কার
মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা
বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও
জন-সাহিত্য
উস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁ
স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ
শিরাজী
আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ
মধুময়
যদি আর বাঁশি না বাজে
কৃষক-শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ
রসলোকের তৃষ্ণা
রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা

নজরুলের চিঠিপত্র[৯]

---

৮. কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রতিভাষণ প্রদত্ত হয়েছিল ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর রবিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। নজরুল সংবর্ধনার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায়।

৯. আবুল আহসান চৌধুরী, 'নজরুলের বিলুপ্ত, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী', ১৯৯৭, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, কুষ্টিয়া।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১। কাজী নজরুল ইসলাম, বাঁধন-হারা, ১৯২৭, সওগাত পত্রিকা

২। কাজী নজরুল ইসলাম, মৃত্যুক্ষুধা ১৩৩৭, বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ সংখ্যা হতে ১৩৩৬ ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত সওগাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩। কাজী নজরুল ইসলাম, কুহেলিকা ১৩৩৫, মুয়াজ্জিন পত্রিকায় প্রকাশিত

৪। কাজী নজরুল ইসলাম, ব্যথার দান (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ), প্রকাশক এম, আফজালুল হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউজ, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা, পৃ. ১৪৮

৫। কাজী নজরুল ইসলাম, রিক্তের বেদন, ১৯৪০, ওরিয়েন্টাল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা

৬। কাজী নজরুল ইসলাম, শিউলিমালা ১৩৩৮, ডি, এম লাইব্রেরী, কলিকাতা

৭। কাজী নজরুল ইসলাম, প্রবন্ধ, ১৩২৬, সওগাত, কলিকাতা

৮। কাজী নজরুল ইসলাম কর্তৃক প্রতিভাষণ প্রদত্ত হয়েছিল ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর রবিবার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। নজরুল সংবর্ধনার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যার মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায়।

৯। আবুল আহসান চৌধুরী, 'নজরুলের বিলুপ্ত, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত পত্রাবলী', ১৯৯৭, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, কুষ্টিয়া।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নজরুলের উপন্যাসে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা

বাঁধন-হারা

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসটি রবিয়ল, নূরুল হুদা, মনুয়র, রবিয়লের মা, রকিয়া বেগম, রাবেয়া, মাহবুবা, সোফিয়া, মাহবুবার মা, আয়েশা বেগম, সাহসিকা এবং শিশু চরিত্র আনারকলির মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসে সর্বমোট ১৮টি পত্রের মধ্য দিয়ে এই চরিত্রগুলো একটি কাহিনির অবতারণা করেছে এবং কাহিনির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সমকালীন একটি সমাজচিত্র। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসটিতে সমকালীন যেসব সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

প্রথম মহাযুদ্ধ। উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদা প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিক। কাজী নজরুল ইসলামও ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসটি নজরুল করাচি সেনানিবাসে বসে রচনা করেননি, তবে সেনানিবাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে এবং সমকালীন সংঘটিত যুদ্ধের বাস্তব বর্ণনার ভিত্তিতে রচনা করেন। করাচি সেনানিবাসে থেকে নবম পত্রে ভাবি ওরফে রবিয়লের স্ত্রীকে নূরুল হুদা লিখেছে-

> "আমাদের 'মোবিলিজেশন' অর্ডার বা যুদ্ধসজ্জার হুকুম হয়েছে। তাই চারদিকে 'সাজ-সাজ' রব পড়ে গেছে। খুব শীঘ্রই আরব-সাগর পেরিয়ে মেসোপটেমিয়ার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে গিয়ে, তাই আমার আনন্দ আর আমাতে ধরছে না। আমি চাচ্ছিলাম আগুন– শুধু আগুন– সারা বিশ্বের আকাশে-বাতাসে, বাইরে-ভিতরে, আগুন আর তার মাঝে আমি দাঁড়াই আমারও বিশ্বগ্রাসী অন্তরের আগুন নিয়ে, আর দেখি কোন আগুন কোন আগুনকে গ্রাস করে নিতে পাওে, আরো চাচ্ছিলাম মানুষের খুন। ইচ্ছা হয়, সারা দুনিয়ার মানুষগুলোর ঘাড় মুচড়ে চোঁ চোঁ করে তাদের সমস্ত রক্ত শুষে নিই, তবে আমার কতক তৃষ্ণা মেটে। কেন মানুষের ওপর আমার এত

শত্রুতা? কি দুশমনি করেছে তারা আমার? তা আমি বলতে পারব না। তবে, তারা আমার দুশমন নয়, তবুও আমার তাদের রক্ত পানের আকুল আকাঙ্ক্ষা।[১]

উদ্ধৃতিটিতে একজন যুদ্ধ সৈনিকের বিপক্ষদলের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা উপচে পড়েছে। মেসোপটেমিয়ায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একটি তাঁবু পড়েছিল এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাস তা সাক্ষ্য দেয়। একাদশ পত্রটিও করাচি সেনানিবাস থেকে লিখেছে নূরুল হুদা বন্ধু 'মনো'র উদ্দেশ্যে। পত্রটিতে সেনানিবাসের অভ্যন্তরের নানা নিয়ম অনিয়ম সেনা অফিসার এবং সৈনিকদের নানান ফাঁকি ঝুঁকি এবং একনিষ্ঠতার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে–

"হাবিলদারজী আজ যে রকম দু-ঘণ্টা ধরে আমায় মাটি খুঁড়িয়েছে! এমন 'কেঠো' হাতেও ফোস্কা পড়িয়ে তবে ছেড়েছে! হ্যাঁ, এই হাবিলদার কিন্তু এক ব্যাটা ছেলে বটে! একেই বলতে তো হয় সৈ-নি-ক-পু-রু-ষ! আমায় পুরো দুটি ঘণ্টা গাধার চেয়েও বেহেজ্ খাঁটিয়েছে, একবার কপালের ঘাম মুছতেও দেয়নি– এমনি জাঁক! অত কষ্টের মধ্যেও আমার তাই একটা তীব্র তীক্ষ্ণ আনন্দ শিরায় শিরায় গরম হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল এবং তা এই ভেবে যে আহা, আর কেউ তো এমন করে দুঃখ দিয়ে আমার সবকিছু ভুলিয়ে দেয় না! এমনি কঠোরতা– না, এর চেয়েও সাংঘাতিক পরুষতা– আমি সব সময় চাইছি, কিন্তু পাই খুব কম! তাই আমার শাস্তির দরুন ঐ দু'ঘণ্টা খাটুনি হয়ে যাবার পর আমি হাবিলদার সাহেবের পাটাতন করা বুকে জোর দুটো থাপ্পড় কষিয়ে বাহবা দিয়েছিলাম। তীক্ষ্ণ উৎসাহের চোটে থাপ্পড় দুটো এতই রুক্ষ আর বে-আন্দাজ ভারি হয়ে পড়েছিল যে, তাঁর চোখে সত্য-সত্যই 'ভুগজুগুনি' জ্বলে উঠেছিল। তাঁর চোখের তারা আমড়ার আঁটির মতন বেরিয়ে পড়লেও লজ্জার খাতিরে তিনি কিছুই হয়নি বলে কপট-হাসি হাসতে চেষ্টা করেছিলেন। পরে কিন্তু তিনি সানন্দে স্বীকার করেছেন যে, আমি বাস্তবিকই তাঁকে একটু বেশি রকমই বে-সামাল করে ফেলেছিলাম এবং তিনি এখন বিশ্বাস করেন যে, এরকম কারে পড়লে দিনেই তারা দেখা যেতে পারে! তবু এই হাবিলদারজিকে বাহাদুর পুরুষ বলতে হবে; কারণ অন্যান্য নায়ক

১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-১য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৩০৮

হাবিলদারদের মতন সে অপরাধীকে না ঘাঁটিয়ে বসে থাকতে দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করে না, কর্তব্যে অবহেলা করে না। তাই আমাদের সৈনিক-সংঘ এঁর নাম রেখেছে, পাষণ্ড দুশমন সিং। এ বেচারা লেখা-পড়া জানে কম, কিন্তু নাচো কুদো ভুলো মৎ অর্থাৎ কাজের বেলায় ঠিক একদম ঘড়ির কাঁটার মতো। তাই আমাদের শিক্ষিত হাম্‌বাগের দল এখনো সাধারণ সৈনিক এবং ইনিইশগগিরই ভারপ্রাপ্ত সেনানী হতে যাচ্ছেন... পন্টনে এসে গাফেলিই তো এক মহা অন্যায়, তার ওপর ব্যাটা ছেলের আবার দুর্বলতা দেখে দেখি– পাছে বাংলার ননীর পুতুলদের নধর গায়ে একটু আঁচ লেগে তা গলে যায়। তাই তাদের কাজ থেকে রেহাই দিয়ে উচ্চ সেনানীদের দিনকানা করা হয়! যেই কোন লেফটেন্যান্ট কাজ দেখতে আসেন, অমনি তারা এমনি নিবিষ্ট মনে, এত জোরে কাজ করতে থাকেন যে, তা দেখে স্বয়ং ব্রহ্মারও 'সাবাস জোয়ান' বলবার কথা! কিন্তু সে যখন দেখে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা কাজ হওয়া উচিত ছিল, তার এক-চতুর্থাংশও হয়নি, তখন বেচারার বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না! গভীর গবেষণা করেও তার গোবরগাদা মগজে এর কারণটা আর সেঁদোয় না– আর কাজেই তাকে বলতে হয় 'বাঙালি জাদু জানতা হেয়'।"[২]

বাঙালি শিক্ষিত যুবকেরা যুদ্ধ করার মত মহান ব্রত নিয়ে সৈনিক বেশেও যে কর্মে কেমন অবহেলা করে নজরুল কৌতুক ভাবে তা জানিয়ে ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তাবুতে থেকেও বাঙ্গালী তখনও যে কতটা নীচ মনোবৃত্তির ছিল 'বাঙ্গালি যাদু জানতা হেয়'। এই উক্তির মধ্য দিয়েই তা ফুটে উঠে। নজরুল যদি সৈনিক ক্যাম্পে না থাকতেন তাহলে সমকালীন এ সমাজ চিত্র কিছুতেই এত বাস্তবতা নিয়ে ফুটে উঠত না।

অষ্টাদশ পত্রটি নূরুল হুদা বাগদাদ [বোগদাদ] থেকে লিখেছেন 'সাহসিকা'র উদ্দেশ্য। পত্রটিতে নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণা, পাওয়া না-পাওয়ার কথাই মূলত ব্যক্ত হলেও তাঁর সৈনিক জীবন সম্পর্কে এক জায়গায় লেখা রয়েছে–'আমাদের পল্টন শিগগির ফিরে যাচ্ছে'।[৩] দ্বিতীয় পত্রটিতে বন্ধু মনুয়রকে সেনানিবাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে নূরুল হুদা লিখেছে,

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩১৬-৩১৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৬৫

"আজ ভোর হতেই আমাদের পাশের ঘরে (কোয়ার্টারে) যেন গানের ফোয়ারা খুলে গেছে, মেঘমল্লার রাগিণীর যার যত গান জমা আছে 'স্টকে' কেউ আজ গাইতে কসুর করছেন না। কেউ ওস্তাদি কায়দায় ধরছেন 'আজ বাদরি বারিখেরে ঝম্‌ঝম্,– কেউ কলোয়াতি চা'লে গাচ্ছেন, 'বঁধু এমন বাদরে তুমি কোথা!' ...গান হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে দু-'চারজন সমঝদার টেবিল, বই, খাঁটিয়া যে যো পেয়েছে সামনে, তাই তালে-বেতালে অবিশ্রান্ত পিটিয়ে চলেছে। এক একজন যেন মূর্তিমান 'বেতাল পঞ্চবিংশতি।"[৪]

১৯১৭ সালে শেষের দিকে নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্য। সামরিক জীবনে অর্থাৎ করাচি সেনানিবাস থেকেই শুরু হয়ে নজরুলের সাহিত্যিক জীবন। নজরুলের কাছে নূরুল হুদার পত্রসহ অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের পত্রে নূরুল হুদার বাঁধন-হারা জীবনের মনস্তাত্ত্বিকমূলক ব্যাখ্যা দান থেকেই গবেষকগণ নজরুলের এই রচনাকে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা বলে থাকেন। কিন্তু এ মন্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। একে আত্মজীবনীমূলক না বলে বরং বলা যেতে পারে লেখকের সমকালীন সমাজ সচেতনতা। মাতৃস্নেহের শাশ্বত রূপ। গর্ভধারিণী না-হলেও মা যে শুধু মা-ই, বাঙালি মায়ের এই পরিচয়টি ফুটে উঠেছে চতুর্থ পত্রটিতে। পত্রটি রবিয়লের মা লিখেছে নূরুল হুদাকে। মা-হারা নূরুল হুদার প্রতি তার মাতৃস্নেহের প্রকাশ ঘটেছে।

"ওরে তোরা কি করে মায়ের মন বুঝবি? তা যদি বুঝতিস তবে আর এমন করে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করতিসনে আমায়। নাই বা হলাম তোর গর্ভধারিণী জননী আমি, তবু আমি কোনোদিন তোকে অন্যেও বলে স্বপ্নেও ভাবতে পারি-নি! একটা কথা আছে, 'পেটে ধারার চেয়ে চোখে-ধরা বেশি লাগে'। তোরা একথা বুঝতে পারবিনে।"[৫]

নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য কিংবা নারীর অধিকারহীনতা, নারী যে কেবল নারী, ঘরের অন্যান্য আসবাবের মতো নারীও একটি আসবাব, নারীর এ অবস্থানের সমাজচিত্র পাওয়া যায় সপ্তম চিঠিতে। চিঠিটি মাহবুবা লিখেছে বান্ধবী সুফিয়াকে। নারীরা যে পুরুষের চোখে কতটা ছোট এবং অর্থহীন সপ্তম চিঠি থেকে তার কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো–

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬৯-২৭০

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭৮

"খোদা আমাদের মেয়ে জাতটাকে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেই পাঠিয়েছেন, আমাদের হাত-পা যেন পিঠমোড়া করে বাঁধা, নিজে কিছু বলাবার বা কইবার হুকুম নেই। খোদা-না-খাস্তা একটু ঠোঁট নড়লেই মহাভারত অশুদ্ধ আর কি! কাজেই, আছে আমাদের শুধু অদৃষ্টবাদ, সব দোষ চাপাই নন্দ ঘোষ-স্বরূপ অদৃষ্টেরই ওপর! সেই মান্ধাতার আমলের পুরানো মামুলি কথা, কিন্তু অদৃষ্ট বেচারা নিজেই আজ তক অ-দৃষ্ট!... আমাদের কর্ণধার মর্দরা কর্ণ ধরে যা করান তাই করি, যা বলান তাই বলি! আমাদের নিজেদের ইচ্ছায় করবার বা ভাববার মতো কিছুই যেন পয়দা হয়নি দুনিয়ায় এখনো,– কারণ আমরা যে খালি রক্ত-মাংসের পিণ্ড। ভাত রেঁধে, ছেলে মানুষ করে আর পুরুষ দেবতাদের সেবা করেই আমাদের কর্তব্যের দৌড় খতম।... কোন্ কেতাবে নাকি লেখা আছে, পুরুষদের পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহশ্‌তে, আর সেসব কেতাব ও আইন কানুনের রচয়িতা পুরুষ! [...] [...] এমন কেউ নেই আমাদের ভেতর যিনি এই সব পুরুষদের বুঝিয়ে দেবেন যে আমরা অসূর্য্যম্পশ্যা বা হেরেম-জেলের বন্দিনী হলেও নিতান্ত চোর-দায়ে ধরা পড়িনি। আমাদেরও শরীর রক্ত-মাংসে গড়া, আমাদের অনুভব শক্তি, প্রাণ, আত্মা সব আছে। আর তা বিলকুল ভোঁতা হয়ে যায়নি। আজকাল অনেক যুবকই নাকি উচ্চশিক্ষা পাচ্ছেন, কিন্তু আমি একে উচ্চ শিক্ষা না বলে লেখাপড়া শিখছেন বলাই বেশি সঙ্গত মনে করি। ...কে বলে দেবে এদের যে, আমাদেরও স্বাধীনভাবে দুটো কথা বলাবার ইচ্ছে হয় আর অধিকারও আছে, আমরাও ভালমন্দ বিচার করতে পারি।"[৬]

উদ্ধৃতিটুকুর পরতে পরতে নারী হৃদয়ের যে হাহাকর ফুটে উঠেছে তা সমকালীন সমাজের নারীর সামাজিক অবস্থাগত চিত্র। পুরুষের শিক্ষা লাভের পরও নারীর উপর যে নীচ মানসিকতা পোষণ এসব চিত্রে কোথাও তা অতিরঞ্জিত নয়। নজরুলের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে কখনো মনস্তাত্ত্বিকের মতো, কখনো দার্শনিকের মতো। মেয়েদের প্রতি মেয়েদের এই হীনমন্যতাও প্রতিষ্ঠিত করেছে পুরুষেরাই। পুরুষেরা যে কত দিক থেকে মেয়েদের মাঝে কত রকম গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ঢুকিয়ে দিয়েছে তার শেষ নেই। শেষে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের শুদ্ধতা জাহির করেছে। ঘরের

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯৬-২৯৭

স্ত্রীকে সাত পর্দার আড়ালে রেখে নিজে গিয়েছে অন্য নারীর ঘরে। অথচ শেষে সেই অন্য নারীকেও সমাজে পতিতা আখ্যায়িত করে আলাদা করেছে সমাজ থেকে। ওদের স্থান হয়েছে পতিতালয়ে। কিন্তু পুরুষ হচ্ছে না আজও পতিত।

বিয়ে ভেঙে যাওয়া কন্যাকে নিয়ে সামাজিক বিপর্যয় বর্তমান সমাজেও প্রকট। তারিখ হয়েও বিয়ে না হলে পরে সে মেয়েকে নিয়ে মেয়ের বাবা-মার কিংবা মেয়ের নিজের জীবনে যে সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে তা বলাই বাহুল্য। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে সমকালীন এই সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। নূরুল হুদার সাথে মাহবুবার বিয়ের তারিখ হয়েও ভেঙে যায়। নূরুল হুদা কাউকে কিছু না বলে যুদ্ধে চলে যায়। ফলে তারিখ হয়েও বিয়ে না হওয়া কন্যাকে নিয়ে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে মাহবুবার বাবা অসুস্থ হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। মাহবুবার মা পরে মেয়েকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন। নারী জীবনের অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ দিকটি চতুর্দশ পত্রটিতে উল্লেখ রয়েছে।

> "এত অপমানের পরও আমরা কোন মুখে সেখানে আবার মুখ দেখাব গিয়ে? এখানে যদি কুকুর বেড়ালের মতো অবহেলা হেনস্থা হয় তাও স্বীকার তবু আর খোদা যেন ও সালার-মুখো না করেন। ...এই যে মাহবুবার বাপ হঠাৎ মারা গেলেন, এটা কার দোষে, কোন বেদনার ঘা সামলাতে না পেরে? তা কি জানো? ...নূরুল আপনার একদিকে পালিয়ে গেল– পালিয়ে বাঁচাল, কিন্তু মাঝে পড়ে সর্বস্বান্ত হলাম আমরা– গরিবরা। মাহবুবার বাবা সে-আঘাত সে-অপমান সহ্য করতে না পেরে দুনিয়া থেকে সরেই পড়লেন, মেয়েরও আমার বুক ভেঙে গেল।"[৭]

মাহবুবার সাথে বীরভূম জেলার শেঙানের চল্লিশোর্ধ এক খুব বড় জমিদারের অসম বয়সের বিয়ে একটি সমকালীন সমাজ-দর্পণ। এ ধরনের বিয়ে বর্তমান সমাজেও প্রচলিত।

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসে মাহবুবার মা কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে বিয়েতে রাজি হলেও বয়স্ক জমিদার তার জমিদারি দৃষ্টিভঙ্গিতেই সুন্দরী বালিকাবধূকে ঘরে তুলে আনেন এবং ক'দিন না যেতেই বাল্যবধূকে বিধবার সাজে সাজিয়ে পরপারে পাড়ি জমান। নিরুপায় মাহবুবার মায়ের আক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে এভাবে–

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৪০

"আমার ভায়েরা বীরভূম জেলার শেঙানের এক খুব বড় জমিদারের সঙ্গে মাহবুবার বিয়ের সব ঠিকঠাক করেছেন। তিনি এক মস্ত হোমরাচোমরা বুনিয়াদি খান্দানের, তবে বয়েসটা চল্লিশ পেরিয়ে পড়েছে এই যা। কিন্তু তাঁর আগের তরফের বিবির এক মেয়ে, আর কেউ নেই। তারো আবার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তারো ঘরে ছেলে মেয়ে। বরের বয়েসটা একটু বেশি, তাহলে আর কি করব! গরিবের মেয়ের জন্য কোন নওয়াবজাদা বসে আছে বলো।"[৮]

মুসলমান হিন্দু ও ব্রাহ্ম– এই তিন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি সমকালীন সমাজচিত্র পাওয়া যায় দ্বাদশ পত্রটিতে। পত্রটি ভাবি রাবেয়া লিখেছেন মাহবুবাকে। মাহবুবার কাছে ব্রাহ্ম গৃহ শিক্ষয়িত্রীর পরিচয় দিতে গিয়ে সে তিন সম্প্রদায়ের পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা বলেছে। যার থেকে এই তিন সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের সমকালীন একটি সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।

"লোকে, বিশেষ করে গোঁড়া হিন্দুরা, কেন যে ভাই ব্রাহ্মদের ঠাট্টা করে আমি বুঝতে পারিনে। আমার বোধ হয় ও শুধু ঈর্ষা আর নীচমনার দরুন। ভাল-মন্দ সব সমাজেই আছে, তাই বলে যে অন্যের বেলায় শুধু মন্দের দিকটাই দেখে ছোটলোকের মতো টিটকারি মারতে হবে এর কোনো মানে নেই। আমার পূজনীয়া শিক্ষয়ত্রী এই ব্রাহ্ম মহিলার কথা মনে পড়লে এখানো একটা বুক-ভরা পবিত্র ভক্তিতে আমার অন্তর মন যেন কানায় কানায় ভরে ওঠে। এই মহিমান্বিতা মাতৃশ্রী-মণ্ডিতা যে ধর্মের নারী, এত অনবদ্য পূত শালীনতা ও সংযমবিশিষ্ট যে সমাজের নারী সে ধর্মকে সে সমাজকে আমি ছালাম করি।"[৯]

উল্লেখ্য হিন্দুদের এই ছুঁৎমার্গ বর্তমান সমাজেও বিদ্যামান। আধুনিক শিক্ষার ফলে শহরে বসবাসরত হিন্দুদের মাঝে অনেকাংশ হ্রাস পেলেও গ্রামঞ্চলে এখানো পুরোপুরি বিদ্যমান। পারস্পরিক সম্পর্ক সমকালীন সমাজের একটি বিরল চিত্র। 'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের আঠারোটি পত্রের সব পত্রই লিখেছে বন্ধু এবং প্রতিবেশী একজন আরেকজনের কাছে। এ ছাড়া জমিদারদের স্বেচ্ছাচারিতা, ভোগলিপ্সা, সমাজের সাধারণ মানুষের উপর তাদের রক্তচক্ষু– এসব বাস্তব চিত্রগুলো মাহবুবার জমিদার স্বামীর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায়।

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৪১

৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩২৮

'বাঁধন-হারা' উপন্যাসের আঠারোটি পত্রের পর্যালোচনা করে যেসব সমকালীন সমাজ চিত্রের সন্ধান আমি পেয়েছি তা উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। তবে উল্লেখ থাকে যে, আমার এ পর্যালোচনা সার্বিক পর্যালোচনা নাও হতে পারে।

মৃত্যুক্ষুধা

'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি রচনার সময় নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগরের চাঁদ সড়কে অবস্থান করছিলেন। চোখে দেখা একটা বাস্তব ঘটনার অবতারণা করে শুরু করেছিলেন উপন্যাস রচনা। অতঃপর নিম্নবিত্ত একটি মুসলিম পরিবারকে ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু করে উপস্থাপন করেছেন সমকালীন একটি সমাজচিত্র। যেসব চরিত্রের মাধ্যমে সমাজচিত্রটি তুলে ধরা হয়েছে সেসব চরিত্রগুলো হচ্ছে প্যাঁকালে, কুর্শি, প্যাঁকালের মা, প্যাঁকালের মার তিন বিধবা পুত্রবধূ, রুবি, লতিফা ওরফে বুচি, ন'কড়ি ডাক্তার, আনসার, নাজির সাহেব, মিস জোন্স, এবং দুটি শিশু চরিত্র পটলি ও হানপে। এখন উপন্যাস পর্যালোচনায় যেসব সমাজচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের জীবনচিত্র 'মৃত্যুক্ষুধা'। এই পরিবারের সদস্যরা হলেন প্যাঁকালে, প্যাঁকালের মা, প্যাঁকালের মার তিন বিধবা পুত্রবধূ, কুর্শি এবং পাঁচি ও তাদের একডজন ছেলে মেয়ে। এই চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে অতি নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনচিত্র অসম্ভব বাস্তবানুভূতির সাথে উপস্থিত হয়েছে। অতি সাধারণ কোনো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যখন-তখন ঝগড়া, আবার বিপদে সবকিছু ভুলে গিয়ে একের জন্য আরেকজনের ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো বাস্তব চিত্র এখানে পাওয়া যায়। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এদের পুরুষরা জনমজুর খাটে অর্থাৎ রাজমিস্ত্রি, খানসামা, বাবুর্চিগিরি বা ঐ রকমের কোনো একটা কিছু করে। আর মেয়েরা ধান ভানে, ঘর গেরস্থালি কাজকর্ম করে; রাঁধে, কাঁদে এবং নানান দুঃখ ধান্দা করে পুরুষদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করে।

বস্তিবাসীদের জীবনের অন্দরমহলের চিত্র এমনভাবে মৃত্যুক্ষুধার পূর্বে অন্যকোনো কথাসাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায়নি। দরিদ্র ঘরে নজরুলের জন্ম।

দারিদ্র্যের কষাঘাতে মায়ামমতা শূন্য বন্ধনহীন জীবন, যুদ্ধের হিংস্র পৈশাচিক পরিবেশে টিকে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াস এবং সর্বোপরি কঠোর জীবনবোধ নজরুলকে জীবন সম্বন্ধে দান করেছে এক অভিনব প্রকাশ ভঙ্গি। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস নজরুলের সেই বোধেরই সফল প্রয়াস।

নিম্নবিত্তদের ঝগড়ার দৃশ্য। নিম্নবিত্ত সমাজের একটি দৈনন্দিন চিত্র হচ্ছে ঝগড়া। পান থেকে চুন খসলেই তারা কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে হাঁটু অব্দি শাড়ি তুলে একজন আরেকজনের প্রতি ঝাল ঝাড়ে। গলা চড়িয়ে হাত নেড়ে, অঙ্গভঙ্গি করে বাক্যবাণে বিপর্যস্ত করে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে। পাশে থেকে ফোড়ন কাটে দর্শকে। আবার পরক্ষণেই হাসাহাসি, ঢলাঢলি। 'মৃত্যুক্ষুধা'র প্রথমেই এমন একটি বাস্তব ঘটনাকে নজরুল তুলে ধরছেন একেবারে তাদের নিজের ভাষায় :

> "কে একজন ক্রিশ্চান মেয়ে জল নিতে গিয়ে কোন এক মুসলমান মেয়ের কলসি ছুঁয়ে দিয়েছে। এদের দুই জাতই হয়তো একদিন এক জাতই ছিল– কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রিশ্চান। আর এককালে এক জাত ছিল বলেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে। এই দুই জাতের দুইটি মেয়েই কম-বয়সী এবং তাদের বন্ধুত্বও পাকা রকমের। কাজেই ঝগড়া ঐ মেয়ে দুটি করেনি। করেছে তারা– যারা এই অনাছিষ্টি দেখেছে।
>
> গজালের মা-র পাড়াতে কুঁদলী নামে বেশ নামডাক আছে। সে-ই 'অপোজিশন লীড' করছে মুসলমান-তরফ থেকে।
>
> অপরপক্ষে হিড়িম্বাও হটবার পাত্রী নয়। তার ভাষা গজালের মা-র মতো ক্ষুরধার না হলেও তার শরীর ও স্বর এ দুটোর তুলনা মেলে না!... গজালের মা গজালের মতোই সরু– হাড্ডি-চামড়া সার কিন্তু তার কথাগুলো বুকে বেঁধে গজালের মতোই নির্মম হয়ে। গজাল উঠিয়ে ফেললেও দেয়ালে তার দাগ যেমন অক্ষয় হয়ে যায়, ঝগড়া থেমে গেলেও গজালের মা-র কটূক্তির জ্বালা তেমনি কিছুতেই আর মিটতে চায় না।
>
> ঝগড়া তখন অনেকটা অগ্রসর হয়েছে এবং গজালের মা বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে বলচে, 'হারাম-খোর, খেরেস্তান কোথাকার! হারাম খেয়ে খেয়ে তোদের গায়ে বন-শুয়োবের মতো চর্বি হয়েছে, না লা?'

গজালের মাকে আর বলবার অবসর না দিয়ে হিড়িম্বা তার পেতলের কলসিটা খং করে বাঁধানো কলতলায় সজোরে ঠুকে, অঙ্গ দুলিয়ে, থ্যাবড়ানো গোবরের মতো মুখ বিকৃত করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'তা বলবি বৈ কি লা সুঁটকি? ছেলের তোর খেরেস্তানের বাড়ির হারাম-রাঁধা পয়সা খেয়ে চেক্‌নাই বেড়েছে কিনা।"[১০]

নিম্নবিত্তদের মাঝে ঝগড়ার এই যে দৃশ্য, এই যে ভাষা, তা খুব কাছ থেকে নজরুল দেখেছেন, অনুভব করেছেন বলেই এমন একটি চিত্র তুলে ধরতে পেরেছেন। যেখানে আবেগ কিংবা ভাষার অলংকার কিংবা অতিবর্ণনা বলে কিছু নেই।

অভাবের চরম অবস্থাতেও একটি নতুন মুখের আগমন কেমন করে দুঃখ ভুলায়, সামাজিক এ চিত্রটি প্যাঁকালের মার সংসার থেকে পাওয়া যায়। পাঁচি প্যাঁকালের একমাত্র বোন। ভালো ঘর দেখে বিয়ে হয়েছিল তার। কিন্তু তার স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করায় অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেই বাপের বাড়ি চলে আসে পাঁচি। এখানেই জন্ম হয় তার প্রথম সন্তান। দারিদ্র্যপূর্ণ বিপন্ন জীবনের আত্ম-আহাজারির মধ্যে। পাঁচির সন্তানের আগমনে পরিবারের সকলে খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ভুলে যায় না-খাওয়ার কষ্ট। শুধু যে দারিদ্র্যের যন্ত্রণাই ভোলে পাঁচির মা তাও নয়, ভুলে যায় তার জোয়ান জোয়ান তিন রোজগেরে পুত্রের অকাল মৃত্যুশোক। লেখকের বর্ণনায়–

"একটি ছোট্ট শিশু তার জোয়ান রোজগেরে ছেলেদের অকাল মৃত্যু ভুলিয়েছে। একটা দিনের জন্যও সে তার দুঃখ ভুলেছে। তার অনাহারী ছেলের কথা ভুলেছে।"[১১]

এ চিত্র যে শুধু পাঁচির মায়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়– এ চিত্র আমাদের সমাজের প্রতিনিয়ত চিত্র। নতুনের আগমনের আনন্দে পুরাতনের বিদায় কষ্ট পুরোপুরি ভুলে যাওয়া সম্ভব না হলেও কিছু সময়ের জন্যও সে কষ্ট হারিয়ে যায় নতুনের আগমনের মাঝে। সমকালীন সমাজের চিত্র হলেও এটি সমকালকে অতিক্রম করে চিরকালের মানবিক অভিব্যক্তিকেই প্রকাশ করেছে।

---

১০. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৩০৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩১১

'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের উক্তিটির যথার্থতা 'মৃত্যুক্ষুধা'র প্যাঁকালের মার তিন বিধবা বৌ-এর এক ডজন ছেলে মেয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তিকালে তাদের যে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাতে উপরের পঙ্‌ক্তির সাথে দ্বিধাহীনভাবে একমত পোষণ করা যায়। বরো অনুচ্ছেদে মেজ বৌ মির্জা সাহেবের বাড়ি থেকে বিড়ালে খাওয়া ফেলে দেওয়া আধা পোয়া দুধ দিয়ে লবণের সাথে খুদগুঁড়ার সাহায্যে রান্না করলে তা খেয়ে এই শিশুদের ঈদের আনন্দ অনুভবের বর্ণনা পাই এভাবে–

> "ক্ষীর-রান্না হয়ে যায়। ছেলেমেয়েরা যে যেখানে যা পায়– থালা, বাটি, ঘটি, বদনা– তাই নিয়ে উনুন ঘিরে বসে যায়।
>
> অপূর্ব সেই ক্ষীর! অদূরে দারোগা মির্জা সাহেবের বাড়ি। তাঁরই বাড়ির দুধ বেড়ালে খেতে না পেরে যেটুকু ফেলে গিয়েছিল, তাই দারোগা গিন্নি পাঠিয়ে দিয়েছেন এদের বাড়ি। ...বাড়িতে চাল ছিল সেদিন বাড়ন্ত। মুরগির সদ্য খোলা হতে ওঠা বাচ্চাগুলির জন্য যে খুদগুঁড়ার রিজার্ভ ট্যোর ছিল ছটাক তিনেক, দারোগা-বাড়ির দুগ্ধ সংযোগে তাই সিদ্ধ হয়ে হল এই উপদেয় ক্ষীর। এই ক্ষুধিত শিশুদের এই আজকের সারাদিনের আহার।
>
> এই তাদের ক্ষীর-পরব– ঈদ।"[১২]

পাঁচ অনুচ্ছেদ এরূপ আর একটি চিত্রের অবতারণা ঘটেছে। "আচ্ছা ছোট্-চা আমাকে কাল থেকে 'যোগাড়' দিতে নিয়ে যাবে? উ-ই ও পাড়ার ভুলোও আমার চেয়ে অনেক ছোট, সে রোজ দু'আনা করে আনে 'যোগাড়' দিয়ে। আচ্চা ছোট্-চা দু-আনায় একটা মাছ পাওয়া যায় না?– তারপর তার বোনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কাল থেকে আমার একা একটি মাছ। দেখাবো আর খাব! ঐ পটলিকে যদি একটা আঁশ ঠেকাই তবে আমার নাম গোরাই নয়, হুঁ হু!"[১৩]

দারোগা গৃহিণীর বেলায় এঁটো করা আধ-পোয়া দুধকে পানি আর মুরগিছানা-ভোগ্য দুধ সহযোগ ক্ষীর রান্না এবং তাই দিয়ে সমগ্র পরিবারের ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টার পর শিশুদের বৌ পালানো খেলা, ছোট চাচার হাতে মাছ দেখে সেই মাছের মুড়ো খাওয়া নিয়ে দরবার বসা এবং শুধু একটা মাছ খাওয়ার লোভে

---

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩১৭
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩১৮

'যোগাড়' দিতে যাবার আয়োজন– নিম্নবিত্ত ছেলেমেয়েদের অতি জীবনঘনিষ্ট চিত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু নজরুলের পক্ষেই এমন করে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে।

অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। নজরুলের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্যাঁকালে ও কুর্শির প্রেমের ভেতর দিয়ে খুব স্পষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। প্যাঁকালে মুসলমান, অপরদিকে কুর্শি খ্রিষ্টান। ধর্মীয় ভেদবুদ্ধিতে খ্রিষ্টান আর মুসলমানের কোনো সামাজিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ। এমনকি সন্দেহভাজন স্পর্শ করাও দুই ধর্মের মাঝে প্রীতির পর্যায়ে পড়ে না। সেখানে প্যাঁকালে ও কুর্শিকে নজরুল টেনে নিয়েছেন কোনো রকম সামাজিক অন্তরায়ের মুখোমুখি দাঁড় না করিয়েই।

শিল্প বিচারে এই ক্ষেত্রে নজরুলের অনেকটাই অসামঞ্জস্যতা চোখে পড়লেও বলা যায় নজরুল নিজের ব্যক্তিজীবনেও সব সাম্প্রদায়িক চিন্তা-ভাবনার ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন সর্বদাই। তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এক হিন্দু রমণীর সাথে। সন্তানের নাম রেখেছেন কৃষ্ণ মোহাম্মদ। দুই ধর্মের দুই অবতারের নাম অনুসারে।

গ্রামীণ ডাক্তাররা সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষের উপর ভিজিট নেয়ার পরিবর্তে কেমন করে শোষণ করে তার একটি পূর্ণচিত্র পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। শুধু তাই নয়, তাদের লোলুপ দৃষ্টির প্রতিফলন ঘটেছে এখানে। সেজ বৌ হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে 'ছিটেন' পাড়ায় নকড়ি ডাক্তার তাকে দেখতে আসেন। তারা গরিব তাই তিনি তাদের কাছ থেকে দয়া করে ভিজিট নেবেন না। কিন্তু শর্ত একটি, তার বৈঠকখানাটা বিনা পয়সায় চুনকাম করে দিতে হবে প্যাঁকালেকে। চুনকাম করতে বেশি সময় লাগবে না, মাত্র দিন তিনেক খাটলেই হয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেবের এই বিরাট মহানুভবতায় প্যাঁকালে চোখের জল মুছে কৃতজ্ঞতার সাথে রাজি হয়।

ডাক্তার এখানেই ছেড়ে দেয়ার পাত্র নন। সেজ বৌকে দেখে চলে যাবার সময় দোরের কাছে হঠাৎ একটু থেমে বললেন– 'হ্যাঁরে মুরগির ডিম আছে তোদের বাড়ি? একটা ওষুধের জন্য বড্ডো দরকার ছিল আমার।' প্যাঁকালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের এই চাওয়াটাতেই অত্যন্ত বাধিত হয়ে ঘরে জমানো গোটা আটেক ডিম এনে ডাক্তারের হাতে তুলে দিল। যা বিক্রি করে ওদের এক বেলার খাবার জোগাড়ের জন্য জমিয়ে রাখা হচ্ছিল একটা একটা করে। রোগী দেখতে

এসে মেজ বৌ-এর রূপের দহনে ডাক্তার নিজেও গেলেন রোগী হয়ে ফিরে। তার বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে–

> "মেজ বৌর শূন্য নিটোল হাত দুটি, এক জোড়া সাদা পায়রার মতো পা আর ঘোমটার অবকাশে সোনার বলয়ের মতো ঠোঁটসহ আধখানি চিবুক ছাড়া আর কিন্তু দেখতে পায়নি। কিন্তু এতেই তার নাড়ি একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বরের রোগীর মতোই দ্রুত চলছিল।"[১৪]

মিশনারিদের ধর্মপ্রচার 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া বিয়ষটি এখানে উপস্থাপিত হয়েছে সমকালীন প্রেক্ষাপটের আলোকে। ঔপনিবেশ পর্যায়ে বাংলার এক শ্রেণির মানুষের রোগ-শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে মিশনারিরা কীভাবে এদেশের মানুষদের খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছে তার একটা নিখুঁত চিত্র নজরুল এ উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে ইংরেজ এদেশে নিজেদের ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে চেয়েছে। মূলত নজরুলের সমকালীন বা তাঁর পূর্বের হিন্দু-মুসলমান লেখকগণ বিষয়টিকে বুঝে এড়িয়ে গেলেও নজরুল তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে যাননি।

নবম পরিচ্ছেদে প্যাঁকালের মার বিধবা সেজ বৌ-এর অসুখের অজুহাতে মিশনারির পাদরি সাহেব এই দরিদ্র পরিবারটিতে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। গায়ে পড়েই তারা নানা সুযোগ সুবিধা প্রদান করত এদের এবং এরই মাঝে অত্যন্ত কৌশলে টেনে নিত নিজ ধর্মের ছায়ায়। প্যাঁকালেদের সংসারে মিশনারিদের প্রবেশের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন লেখক এভাবে–

> "হঠাৎ একদিন একপাল ছেলেমেয়ে চিৎকার করতে করতে ঘরে এসে বলল, 'ওগো তোমাদের বাড়িতে পাদরি সায়েব আর মেম আসছে!' বাড়িশুদ্ধ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল! সত্যি-সত্যিই একজন পাদরি সায়েব, সঙ্গে একজন নার্স নিয়ে ঘরে ঢুকল এসে। ...সায়েব বাংলা ভালোই বলতে পারে। বলল, 'টোমরা ভয় করবে না। হামি টোমাদিগের কষ্ট শুনিয়া আসিয়াছে। টোমাদের কে পিরিটো আছে, টাহাকে ঔষড ডিবে।' প্যাঁকালের মা একটু মুশকিলেই পড়ল প্রথমে। পরে আমতা আমতা করে বলল, 'খোদা তোমার ভালো করবেন সায়েব। ঐ

---

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩২০

আমার বৌ আর তার খোকা শুয়ে। দেখ, যদি ভালো করতে পার। কেনা হয়ে থাকব তাহলে?'

সায়েব খুশি হয়ে বলল, 'কোনো চিনটা নাই। যিশু বালো করিয়া ডেবে। যিশুকে প্রারঠনা করো।' ...নার্স সেজ-বৌকে পরীক্ষা করতে লাগল। ...তারপর প্যাঁকালের মাকে ডেকে কতকগুলো ঔষধ দিয়ে যাওয়ার সময় ইত্যাদি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে চলে গেল। ...মেম সায়েব যাবার বেলায় এক টাকা দিয়ে গেছে সেজ-বৌয়ের পথ্যি কিনতে।"[১৫]

এই পরিবারটিতে মিশনারিরা তাদের ভালোমানুষী আচরণ দিয়ে প্রথম দিনেই কতটা প্রভাব ফেলে, তারা চলে যাবার পর মেজ-বৌয়ের উক্তিতেই এর সত্যতা মেলে। মেজ বৌ কাঁদতে কাঁদতে বলে,

"সেজ-বৌয়ের যাবার সময়ও ঘরের পয়সায় দুটো আঙুর কি একটা বেদানা দিতে পারলুম না! শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে। গেঁয়াতকুটুমের মুখে! সাধে সব খেরেস্তান হয়ে যায়! শাশুড়িও কেঁদে বলে, 'যা বলেছিস মা'।"[১৬]

মিশনারিদের চিকিৎসাতে সেজ-বৌ এবং তার ছেলেকেও বাঁচানো গেল না কিন্তু এরই মাঝে মিস জোন্স গায়ে পড়েই একটা বাড়াবাড়ি রকমের সম্পর্ক গড়ে তুলল মেজ বৌ-এর সাথে। মেম সাহেবের অস্বাভাবিক ভালোমানুষী আচরণে মেজ বৌও তাকে আর মেম সাহেব বলে অতিরিক্ত সংকোচের ভাব করে না, তাদের সম্পর্ক বন্ধুত্বে পরিণত না হলেও যথেষ্ট সহজ হয়ে উঠেছে।

মিশনারিরা এভাবেই আমাদের সমাজের দুর্বল মানুষগুলোর দুর্বলতায় কোমলতার ছোঁয়া মিশিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত। তারপর আস্তে আস্তে ধর্মান্তরিত করে ফেলত। কিন্তু নিজেদেরকে কখনোই দোষীরূপে প্রমাণ করার কোনো ফাঁক-ফোঁকর রাখত না। সবাই স্বেচ্ছায় স্বধর্ম ত্যাগ করত। ধর্মত্যাগকারীদের মুখ দিয়েই তা অবলীলায় প্রকাশ করে ফেলত এবং এটা মেজ বৌ-এর চরিত্রের মধ্য দিয়েই লেখক দেখাতে চেয়েছেন খুব স্পষ্ট করে।

মিস জোন্সের অস্বাভাবিক দয়াশীল ও ভালোমানুষী আচরণে মেজ বৌ প্রথমে একদিন, দুদিন করে যেত মিশনারিদের ওখানে এবং এক পর্যায়ে সে তার

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৩০

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৩১

ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ধর্মান্তরিত হয়ে একবারেই চলে যায়। মিশনারিদের নিয়ে চাঁদ সড়কে ভীষণ একটা হৈ চৈ শুরু হলে আনসার এগিয়ে আসে খ্রিষ্টানদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে। সে যায় মিশনারিদের গীর্জায়।

আনসার কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই মিস জোন্সের সাথে মেজ বৌ ওরফে হেলেন ঘণ্ডে ঢোকে। অতঃপর মিস জেন্সের সাথে সৌজন্যমূলক দু'চারটা কথা সারার পর আনসার সরাসরি মেজ বৌ-এর কাছে জানতে চাইল–

> "আচ্ছা বলুন ত আপনার হঠাৎ খ্রিষ্টান হবার কারণ কি? মেজ বৌ তার আনতনয়ন আনসারের মুখে তুলে ধরেই আবার নামিয়ে ফেলে বলল, 'আমি হঠাৎ খ্রিষ্টান হইনি।' আনসার হেসে ফেলে বলল, 'তার মানে আপনি একটু একটু করে খ্রিষ্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি?' মেজ বৌ তার সেই যাদুভরা হাসি হেসে বলল, 'জি না। আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিষ্টান করেছেন।"[১৭]

মেজ বৌয়ের এই স্ব-ঘোষিত স্বীকারোক্তিতে কোথাও প্রমাণ মেলে না যে, মিশনারিরা তাকে খ্রিষ্টান বানিয়েছে বা খ্রিষ্টান হতে বাধ্য করেছে।

মৌলভিদের স্বেচ্ছাচারিতা। সমাজের দরিদ্র নিম্নশ্রেণির উপর মোল্লা তথা মৌলভিরা কেমন করে তাদের স্বস্বীকৃত রায় চাপিয়ে দিয়ে হয়রানির শিকার করত নজরুল তাও এখানে তুলে এনেছেন অত্যন্ত বাস্তব প্রেক্ষাপট থেকে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের উনিশ অনুচ্ছেদে খুব অল্প পরিসরে সমাজে মৌলভিদের এই স্বেচ্ছাচারিতার বর্ণনা পাওয়া যায়। মেজ বৌ হঠাৎ করেই তার ছেলেমেয়ে নিয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গেলে এ নিয়ে এলাকায় বেশ একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। প্যাঁকালের মার আর্ত আহাজারিতে সমস্ত পাড়ার আবহওয়া ভারি হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে নাসারাদের বজ্জাতি এবং প্যাঁকালের মার পরিবারকে সমাজে দায়মুক্ত করার অভিপ্রায়ে নিজ থেকেই এগিয়ে আসে পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব। তার বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসে এরকম–

> "পাড়ার মসজিদের মোল্লা সাহেব সেদিন মগরেবের নামাজের পর নিজে নিজে যেচে প্যাঁকালেদের বাড়ি মৌলুদের ও তৎসঙ্গে বেইমান নাসারাদের বজ্জাতি সম্বন্ধে ওয়াজের জলসা বসালেন। পুরুষ-মেয়েতে বাড়ি সরগরম হয়ে

---

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৬৩-৩৬৪

উঠল। মৌলুদ ও ওয়াজের পর স্থির হল যে, কালই মওলানা হযরত পির গজনফর সাহেব কেবলা ও মওলানা রুহানি সাহেবকে এই গোমরাহ্ বেদিনদের নসিহত ও দরকার হলে বহস করার উদ্দেশ্যে আনবার জন্য লোক পাঠাতে হবে এবং তার সমস্ত খরচ বহন করবে পাড়ার লোকেরা। প্যাঁকালের মা আপাতত তার বাড়ির ছাগল কয়টা বিক্রি করে পনর টাকা যোগাড় করে দেবে। নইলে সে সমাজে পতিত থাকবে।"[১৮]

আনসার মেজ বৌয়ের কথা আগেই শুনেছিল তার বোন বুঁচির কাছে। তাই মৌলানাদের জলসায় রায় শোনার জন্য অতি উৎসাহী হয়েই গিয়েছিল সেখানে, শেষে মৌলভিদের এই রায় শোনার পর অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ঘরে ফিরে গেল। লতিফা সভার সিদ্ধান্ত জানতে চাইলে তিক্তস্বরে আনসার বলল,

"মেজ বৌ হল খ্রিষ্টান, লাভ হল পির আর মাওলানা সাহেবদের। আর মরার উপর খাঁড়ার ঘা– বেচারি প্যাঁকালের মা-র। কপাল তো এমনিই পুড়েছে, যেটুকু বাকি ছিল– মোল্লাজি তাও শেষ করে গেলেন। এরপরে যদি কাল শুনি যে, প্যাঁকালেরা ঘরগোষ্ঠী মিলে খ্রিষ্টান হয়ে গেছে বুঁচি তাহলে আমি কিছু বলব না।"– একটু থেমে আনসার বিষাদঘন কণ্ঠে বলে উঠল, 'বুঝলি বুঁচি, প্যাঁকালের মা এত কেঁদে বেড়িয়েছে কিন্তু আজ মৌলুদ শরিফ হয়ে যাবার পর এবং পাড়ার মোল্লা মোড়লদের সিদ্ধান্ত শোনার পর থেকে কান্না একেবারে থেমে গেছে! আহা বেচারি! ঐ ছাগল ক'টাই ওর সম্বল–তাই তাকে কাল বিক্রি করতে হবে। নইলে ওর জাত যাবে পাড়ার লোকের কাছে।"[১৯]

গ্রামের কুসংস্করাচ্ছন্ন মোল্লা মোড়লদের নিয়ে আনসারের মুখ থেকে এসব বক্তব্য বের হয়ে আসার পর এ সম্পর্কে আর মন্তব্য করা অর্থহীন। এখানে নজরুল একাধারে একজন সমাজ বিজ্ঞানীর মতো সমাজের সমস্যা তুলে ধরে তার মনোবিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে। 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের এসব সামাজিক খুঁটিনাটি বিষয়গুলো পর্যালোচনা শেষে খুব সুষ্ঠুভাবেই বলা যায় উপন্যাসটি তাঁর মনোজগতের বিশ্লেষণেরই সফল প্রকাশ।

---

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৫৯

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৬০

কুহেলিকা

'কুহেলিকা' উপন্যাসে যে সমাজচিত্রটি পাওয়া যায় সেটিকে একটি সমকালীন সমাজ-দর্পণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় দ্বিধাহীনভাবে। হারুন, আমজাদ, আশরাফ, রায়হান ওরফে কুম্ভীর মিয়া, তরিক, ইউসুফ, তমিজ প্রমত্ত, সমরেশ, অনিমেষ, ভূণী ওরফে তাহমিনা, সোমি, জয়তী দেবী, চম্পা ওরফে আমিনা, দেওয়ান সাহেব, হারুনের মা বাব,া উল্‌ঝুলুল ওরফে জাহাঙ্গীর, খান বাহাদুর ফররোখ (জাহাঙ্গীরের পিতা), ফিরদ্দৌস বেগম (জাহাঙ্গীরের মাতা) প্রমুখ চরিত্রের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। উপন্যাসে সমকালীন যেসব সমাজচিত্র তুলে আনা হয়েছে তা নিম্নে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো।

মেসের জীবনচিত্র। ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে এসে কলকাতার কলেজে ভর্তি হয়ে মেসে উঠে ছাত্ররা স্বল্প ব্যয়ে থাকা ও পড়াশোনা করত। তারপর তাদের মাঝে গড়ে উঠত বন্ধুত্ব। সৃষ্টি হতো আত্মার বন্ধন। উপন্যাসের শুরুতেই এ চিত্রটি অত্যন্ত বাস্তব-ঘেঁষা হয়ে চিত্রিত হয়েছে। চিত্রটি এমন–

> যে স্থানে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে 'মেসে' হইলেও হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।
>
> দুই তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ-বাইশজন তরুণ। ইহাদের একজন– লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা– একজন ইয়ারের উরু উপাধান করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে। [...] [...] উলঝুলুল পুঞ্জিভূত ধূম্র নাসিকা ও মুখ-গহ্বর দিয়া উদ্‌গীরণ করিয়া আরো বলিবার আয়োজন করিতেই চা, গুড়ের সন্দেশ এবং লুচি আসিয়া হাজির হইল। দেখা গেল যুবকদের কাছে নারী অপেক্ষাও গুড়ের সন্দেশ অনেক মিষ্টি এবং লুচি ও চা ঢের ঢের প্রিয়। গুড়ের সন্দেশ ও লুচিতে নারী ডুবিয়ে গেল। তাহাদের খাইবার ধরন দেখিয়া মনে হইল, যেন বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অথবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ফেরত একদল বুভুক্ষু। কুম্ভীর মিয়া এক গালে এক ডজন লুচি ও এক গালে এক ডজন গুড়ের সন্দেশ পুরিয়া মুখ সঞ্চালন বিদ্যার যে অদ্ভুত আর্ট দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া কেহ হাসিতেছিল– কেহ ঐ বিদ্যা আয়ত্ত্ব করিবার মক্স করিতেছিল, আর যাহারা

রাগিয়া উঠিতেছিল তাহাদের মধ্যে একজন খানিকটা নস্য লইয়া কুম্ভীর মিয়ার নাকে ঠাসিয়া দিল। কুম্ভীর মিয়া নস্য লইত না। অতএব ইহার পর যে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা না বলাই ভালো। ... আড্ডা যখন ভাঙিল তখন রাত্রি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

বাবুর্চি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে-যা পারিল দুটা মুখে গুঁজিয়া দিয়া আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।[২০]

সমকালীন এই যে সমাজচিত্র এ চিত্র সমকালকে অতিক্রম করে এখনও বর্তমান। স্বল্প ব্যয়ে মেসের জীবন, পড়াশুনা, বন্ধুত্ব, আড্ডা। ছোট্ট একটা রুমে চার পাঁচটি চৌকির উপর আট-দশ জনের এভাবেই চলে মেসের জীবন। এরই মাঝে আবার চলে তাদের পড়াশুনা।

নারী চরিত্র। নজরুলের দৃষ্টিতে নারী চরিত্রের একটি বাস্তব ঘনিষ্ঠ চৎমকার বর্ণনা লক্ষ্য করা যায় এই উপন্যাসে। যা সমকালীনও বটে। নারী কুহেলিকা নারী প্রহেলিকা নারী অহমিকা নারী নায়িকা ইত্যাদি। নারী বিষয়টি যদিও সমকালীন সমাজের প্রেক্ষিতে অতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উপস্থাপিত হয়নি উপন্যাসে, তথাপিও যেখানে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা চলেছে দীর্ঘসময় ধরে হাস্যময় এবং কৌতুকের মধ্য দিয়ে তা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজচিত্র। হারুনের উক্তিতে তার প্রকাশ–

"কী গভীর রহস্য ওদের চোখে-মুখে। ওরা চাঁদের মতো মায়াবী, তারার মতো সুদূর। ছায়াপথের মতো রহস্য। ...শুধু আবছায়া, শুধু গোপন। ওরা যেন পৃথিবী হতে কোটি কোটি মাইল দূরে। গ্রহ-লোক ওদের চোখে চেয়ে আছে অবাক হয়ে খুকি যেমন করে সন্ধ্যাতারা দেখে। ওদের হয়তো শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা, চোখের জলে বাদলা-রাতে চারপাশের বিষাদ-ঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বৃত্ত রচনা করে। দু-দণ্ডের তরে, তারপর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা, ওদের অনুভব কর, দেখ, কিন্তু ধরতে যেয়ো না।"[২১]

---

২০. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-৩য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২৬৩-২৬৯

২১. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬৬

নারী সম্পর্কে হারুনের এ মন্তব্যে অনেকেই অনেক মন্তব্য করল। কেউ মেনে নিল। কেউ বিরোধিতা করল। তার মেসের আড্ডা আরো জোরদার হয়ে উঠল। আইনের ছাত্র আমজাদের ভাষায় নারী প্রহেলিকা। এর পক্ষে তার যুক্তি হলো, সাত সমুদ্দুর তেরো নারী সাঁতরিয়েও বিবি গুলে-বকৌলর কিনারা করা যায় না। নতুন বিবাহিত আশরাফের মতে, "তাহার বধূ ত্রয়োদশী যৌবনমুখী। কিন্তু এত সাধাসাধি করিয়া এত চিঠি লিখিয়া সে কেবল একটিমাত্র পত্রের উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়। তাহাতে শুধু লেখা দুইটি লাইন– 'রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন'।" জাহাঙ্গীর ওরফে উল্‌ঝুলুল নারী সম্পর্কে সবার মতকে মৃদু হেসে উড়িয়ে দিয়ে বিজ্ঞের মতো বললো, 'নারী নায়িকা'। এর পক্ষে তার মত হলো–

> "নারী মাত্রই নায়িকা। ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলেছে। ...তবে বড্ডো বজ্র আঁটুনি– অবশ্য গেরো ফস্কা। কত 'চোখের বালি', কত 'ঘরে-বাইরে', কত 'গৃহদাহ', 'চরিত্রহীন' সৃষ্টি করছে নারী, তার ক'টাই বা তোমাদের চোখে পড়ে কবি। ...যে কোনো মেয়েকে দুটো দিন ভালো করে দেখ, দেখবে লক্ষ্মী-পক্ষী ইত্যাদি চতুর পুরুষের দেয়া যতসব বিশেষণ কোনোটাই তাকে মানায় না। তবে নারী বেচারি সংস্কার আর সমাজের খতিরে সে যা নয়, তাই হবার জন্যে আমরণ সাধনা করছে। সে যুগ যুগ ধরে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে খুশি করছে! পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে শিখাচ্ছে দাঁড় ও ছলাকলার মহিমা। সামনে সামনে বোঝা-পড়া হলে নারীকে দেখত শুধু নায়িকা রূপেই। ...তোমরা যারা নারীকে পূজা কর, আমার এ নির্মমতায় হয়তো ব্যথা পাবে, কিন্তু আমি নারীকে পূজা না করলেও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয়তো তোমাদের চেয়ে বেশিই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলঙ্কার পরিয়ে সুন্দর করে– সিঁদুর কঙ্কন পরিয়ে কল্যাণী করে নয়। আমি সহজ নারীকে, নিরাভরণাকে করি বন্দনা। রাঙতার সাজ পরিয়ে নারীকে দেবী করবার সাধনা আমার নয়। তিন হাত নারীকে বারো হাত শাড়ি পরিয়ে বিপুল করে, বাইশ সের লুৎফুন্নিসাকে হীরা জহরত সোনাদানা পরিয়ে এক মণ ভারাক্রান্ত করে নারীকে প্রশংসা করার চাতুরী আমার নয়।"[২২]

---

২২. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৬৭

মেসের হাস্যরসের আড্ডার নারী সম্পর্কে জাহাঙ্গীরের এসব তত্ত্ব এবং তথ্যপূর্ণ দীর্ঘ বক্তব্যে সমকালীন সমাজের নারীর অবস্থানগত একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

জমিদারি প্রতাপ। জমিদারেরা তাদের প্রভাব কীভাবে বিস্তার করত শুধু প্রতিপত্তির জোওে, তার সমসাময়িক একটি সমাজচিত্র এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের বাবা ছিলেন কুমিল্লার বিখ্যাত জমিদার ও মানিলোক। বাবার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর হয় তার উত্তরাধিকারী। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মা জমিদারি কৌশলে তা রহিত করেন।

> "জাহাঙ্গীরের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার পিসতুত ভায়েরা সম্পত্তি দাবি করিয়া নালিশ করিল, তখন তাহার বুদ্ধিমতী জননী এ কেলেঙ্কারি বেশিদূর গড়াইবার পূর্বেই কি করিয়া যে ইহা চাপা দিয়া ফেলিল, তাহা দুই-চারিজন ছাড়া কেহই জানিতে পারিল না। অবশ্য ইহার জন্য তাহাদের বিপুল জমিদারির প্রায় এক-চতুর্থাংশ আয় কমিয়া গেল। তাহার পিসতুত ভায়েদের অবস্থা এত বড় মামলা চালাইবার মতো স্বচ্ছল ছিল না। কাজেই তাহারা এত সহজে অভাবনীয়রূপে যে সম্পত্তি পাইল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিল, এমনকি তাহারা আদালতে স্বীকারও করিল যে, জাহাঙ্গীর সত্যসত্যই খানবাহাদুরের বিবাহিত পত্নীর পুত্র।"২৩

জমিদারি পরিচালনায় নারীও যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় জাহাঙ্গীরের মায়ের চরিত্রে।

জমিদারদের ব্যাভিচার। সমকালীন সমাজের এটি একটি অসম্ভব বাস্তব-ঘেঁষা চিত্র। জমিদারেরা তাদের প্রতিপত্তি বিস্তার করে রংমহলে নারী নিয়ে মজা করত। তার প্রায়শ্চিত্ত করত হাজারো পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তান। তাদেরই একজন জাহাঙ্গীর। যার আর্তনাদ তৈরি করেছে উপন্যাসের পটভূমি। জমিদারদের এসব ব্যভিচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'কুহেলিকা' উপন্যাস। উপন্যাসের জমিদারপুত্র জাহাঙ্গীর। সে জমিদারপুত্র ঠিকই তবে জমিদারের কামজ পুত্র। নর্তকীর সাথে দেহ মিলনের ফলে জন্ম হয় তার। ফলে বাবা মার পাপ-পঙ্কিলতার মাঝে নিজের জন্মের জন্যে নিষ্ফল আক্রোশ সমাজের বুকে হাহাকার করে মাথা কুটে

---

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৮৬-২৮৭

মরে সে। তার মা কলকাতারই একজন ডাকসইটে বাইজি এবং তার পিতা চিরকুমার। সে তার পিতা-মাতার কামজ সন্তান। জন্ম পরিচয় জানার পর ক্লান্ত, বিপর্যস্ত জাহাঙ্গীর প্রমত্তের কাছে ছুটে যায়। প্রমত্ত তখন জাহাঙ্গীরের বিপর্যস্ত চেহারা দেখে জানতে চায় আবার কারও সাথে সে ঝগড়া করেছে কিনা। জাহাঙ্গীর তখন মাতালের মতো উত্তর দিয়েছিল–

> "বিধাতার সঙ্গে! আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারি না প্রমত-দা। না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র,– আমি জারজপুত্র! শেষ দিকে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ বেদনায় ঘৃণায়, কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।"[২৪]

জন্ম পরিচয় নিয়ে জাহাঙ্গীরের এই আত্মগ্লানিতে প্রমত্ত সহানুভূতির ছায়াতলে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কোনো অসহায় মানুষই তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়'। জাহাঙ্গীর এক্কেবারে অকূলে কূল পাবার মতো দিশেহারা হয়ে পড়ে। জন্ম পরিচয়হীনতার অপরাধ থেকে মুক্তি পাবার আকুলতায় উত্তেজিত কণ্ঠে বলে,

> "সত্যি বলছেন প্রমত-দা? আমি তাহলে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে। আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু-পিতাকে দেখতে পেয়েছি। দেখুন প্রমত-দা, আমি জীবনে কখনো কু-কথা উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা বলে গালি দিয়ে আমার রসনা কলঙ্কিত করেছি,;– সে নারী আমার জন্মদাত্রী! না প্রমত-দা আমার প্রতি-রক্তকণা অপবিত্র– আমার অণু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দূষিত প্রবৃত্তি কিলবিল করে ফিরছে বিছের বাচ্চার মতো– যে কোনো মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে আজকের মতো। ...পাপের যূপকাষ্ঠে আমার বলি হয়ে গেছে।"[২৫]

জাহাঙ্গীরের এ আর্তনাদ প্রতিটি অবৈধ সন্তানের আর্তনাদ। পিতৃ-পরিচয়ের জন্যে হাহাকার করে পিতৃ-পরিচয়হীন সন্তানেরা যায় বিপথে। প্রচণ্ড অভিমানে বেছে নেয় অনাকাঙ্ক্ষিত জীবন।

---

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৮১
২৫. প্রাগুক্ত

স্বদেশি আন্দোলন। স্বদেশি আন্দোলনের গভীরতা 'কুহেলিকা' উপন্যাসের রাজনৈতিক বিষয় নয়। তবু স্বদেশি আন্দোলন থেকেই যে বিপ্লববাদী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পটভূমি তৈরি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> "তখন স্বদেশী যুগের বান ডাকিয়াছে। ইংরেজ তাহার রাজত্ব ভাসিয়া যাওয়ার ভয় না করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা একটু অতিরিক্ত করিয়াই করিতেছিল। ঘরের ঘটিবাটি সে সামলাইতেছিল না বটে। কিন্তু বাঁধ সে ভালো করিয়াই বাঁধিতেছিল।"[২৬]

বিপ্লববাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের রাজনৈতিক পটভূমি তৈরি করেছে বিপ্লববাদী ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর, চম্পা, জয়তী দেবী এই চারটি চরিত্র কেন্দ্র করেই উপন্যাসের এই রাজনৈতিক পটভূমির আবর্তন ঘটেছে। জাহাঙ্গীর যখন মাত্র স্কুলে পড়ে তখনই সে বিপ্লববাদী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করে স্কুল শিক্ষক প্রমত্তের কাছে। উপন্যাসের তিন অনুচ্ছেদের থেকে এই রাজনৈতিক পটভূমির আবির্ভাব ঘটে। তিন অনুচ্ছেদে প্রমত্তের এক বক্তব্যের মাঝে টলস্টয় ভক্ত এক বিপ্লবী বলেছিল–

> "কিন্তু প্রমত-দা আমরা মার খেয়েই মারকে জয় করব– এ কি একেবারেই মিথ্যা?" এর উত্তরে প্রমত্ত উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়–
>
> "তা হলে আমরা বহুদিন হলো জয়ী হয়ে গেছি! কারণ, আমরা নির্বিকারচিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার খেয়েছি যে, যারা মেরেছে তারাই শেষে দিকশিক মেরে গেছে। আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হুন মেরেছে! আরবি ঘোড়া মেরেছে চাট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরানি মেরেছে ছুরি, তুরানি হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসি ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকি ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু, যার জোরে এত মারের পরও এ-জাত মরেনি– তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজি। এত মহামারীর পরও যদি কেউ বলেন– 'আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি', তবে তাঁর দর্শনকে আমি শ্রদ্ধা করি– কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করিনে।"[২৭]

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭২
২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭৪

বিপ্লবীদের মাঝে মুসলমান সম্পর্কে হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মনোভাব। জাহাঙ্গীরকে বিপ্লববাদে দীক্ষা দেয়া নিয়ে এই মনোভাবের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে ওঠে অনিমেষ, সমরেশ প্রমুখ বিপ্লববাদীদের মাঝে। জাহাঙ্গীরকে বিপ্লববাদে দীক্ষা দেওয়ার একটাই আপত্তি– জাহাঙ্গীর মুসলমান। দীক্ষাপ্রাপ্ত কোনো বিপ্লবীরই অধিকার ছিল না নেতার সিদ্ধান্তের মুখে কোনো কথা বলা। তারপরও এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তাদের প্রতিবাদের মুখে জাহাঙ্গীরকে স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা দেয়ার স্বপক্ষে প্রমত্ত বলে–

> "দেখ আমাদের অধিনায়ক বজ্রপানি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এ মতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে, বাংলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীদের আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য, তাঁর স্পষ্ট নিষেধ থাকলে আমি জাহাঙ্গীরকে এ দলে নিতে পারতাম না। তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরিলোভী, না-হয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ঐ রকমের, তা বিশ্বাস করার তো কোনো হেতু দেখিনে।... দেশপ্রেম তাদের মধ্যে জাগেনি– ওদের কেউ নেতা নেই বলে। আর, ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাংলারই জলবায়ু দিয়ে তো ওদেরও রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি। যে শক্তি যে তেজ যে ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাকবে না কেন? তাছাড়া আমি মুসলমান ধর্মের যতটুকু পড়েছি, তাতে জোর করেই বলতে পারি যে, ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্ত্বনা 'অহিংসা পরম ধর্ম'কে কখনো বড় করে দেখেনি! দুর্বলেরা অহিংসার যত বড় সাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও জিনিসটে মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি বলে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই।"[২৮]

মুসলমান সম্পর্কে প্রমত্তের এই দীর্ঘ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুসলমান সম্পর্কে হিন্দুদের প্রচণ্ড একটা হীনমন্যতার স্পষ্টতা ফুটে ওঠে। প্রমত্তের এ বক্তব্যের পেছনে এ কণ্ঠস্বর লেখকের বলেও মনে হয়। কারণ লেখক অসাম্প্রদায়িক নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রমত্তের এই দীর্ঘ বক্তব্যের পরও জাহাঙ্গীরের প্রিয় বন্ধু অনিমেষ বলল–

> "প্রমত-দা জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ার অন্তত আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখেনি। তাকে

---

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭৩

আমি দেখছি মানুষ হিসাবে। সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর না বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি– ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি।"[২৯]

প্রমত্তের দেশ প্রেমিকতায় কোনো কার্পণ্য নেই, কোনো দ্বিমত বা একনিষ্ঠতায় কোনো সন্দেহ নেই। দেশ-মাতৃকার জন্য নিবেদিত প্রাণ সে। কিন্তু নিজের ধর্মের ব্যাপারে বড্ড বেশি অহংকারী। মুসলমানদের প্রতি কোথাও কোথাও তার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলেও কোথাও তার নিজ ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত আস্থা এবং গর্ববোধ মুসলমানদের প্রতি হীনমন্যতারই স্পষ্ট প্রকাশ। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের সমকালীন রাজনৈতিক মনোভাব প্রমত্ত চরিত্রে খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

নিম্নবিত্ত একটি পরিবারের সুখী সুন্দর জীবনচিত্র। পরিবারটি জাহাঙ্গীরের বন্ধু হারুনদের। হারুনের মা উন্মাদিনী। হারুনের বড় একটি ভাই ছিল। হারুনের চেয়ে বছর দুই বড়। নাম মিনা। তেরো বছর বয়সে সে মারা যায়। তখন থেকেই পুত্রশোকে হারুনের মা উন্মাদ হয়ে যান। মিনা মৃত্যুর সময় বিকারগ্রস্ত অবস্থায় 'আমি সাইকেল চড়ব, আমায় সাইকেল কিনে দাও' বলে অনেক কেঁদেছিল। হারুনের মা এখন উন্মাদগ্রস্ত অবস্থায় মিনা আর সাইকেল, বলেই পাগলামি করেন বেশি।

হারুনের বাবা বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্ধ। ছোট দুই বোন ভূণী আর মোমী, ছোট ভাই মোবারক। হারুন কলকাতার মেসে থেকে টিউশনি করে কলেজে পড়ে। বাবার পেনশনের স্বল্প টাকায় অতি দীনভাবে সংসার চলে ওদের। তারপরও আতিথেয়তা বা নিজেদের মাঝে সুখের কমতি নেই এদের। হারুনদের বাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায় এরকম–

"গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই-একটি বাড়ির পরেই তাহাদের জীর্ণ খড়ো ঘর। হারুন ঘরের দুয়ারে আসিয়া পঁহুচিতেই তাহার দুই বোন ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইল। তাহারা তাহাদের আনন্দের আতিশয্যে হারুনের পিছনে জাহাঙ্গীরকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই তাহারা

---

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৭৪

জিভ কাটিয়া ছুটিয়া পালাইল। হারুন বাহিরের দরজা খুলিয়া দিয়া ভাঙ্গা তক্তপোষে বিছানা পাতিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, 'দোহাই হারুন তোমার ভদ্রতা রাখ'!"[৩০]

নারীর আত্মমর্যাদাবোধ এবং তার নারীত্ব সম্পর্কে সংস্কার বোধ। ভূণী এবং চম্পা চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে নারীর চিরাচরিত একটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। ভূণীরা একসময় প্রতাপশালী ছিল কিন্তু কালের করালগ্রাসে এখন নিঃস্ব। কিন্তু আত্মমর্যাদাবোধ এখনো এতটুকু নড়বড়ে হয়নি। জাহাঙ্গীর তাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে তার উন্মাদিনী মায়ের দ্বারা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে জাহাঙ্গীর অনাকাঙ্ক্ষিত ভাবলেও ভূণী তাকে খোদার ইঙ্গিত বলেই মেনে নেয়। জাহাঙ্গীর তার আর্তিতেও চলে যায়। এবং স্টেশনে পৌঁছে কী মনে করে ভূণীকে চিঠি লিখে পাঠায়। জাহাঙ্গীরের পত্রের উত্তরে ভূণী যে পত্র লিখে তা থেকেই তার আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদাবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভূণী লিখেছিল–

"যদি মা আমাকে আপনার হাতে সঁপিয়া না দিতেন, আমি আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া অপমানজনক মনে করিতাম। আপনি যাহাকে চিরজীবনের নির্বাসন-দণ্ড দিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ তাহার প্রতি এই করুণার হেতু কি জানি না। আমি আপনাকে যতটুকু বুঝিয়াছি– তাহাতে আমার ধারণা– হৃদয় ছাড়া আপনার সকল কিছুই আছে। কিন্তু সে সকল লইয়া তো– নারী আমি– আমার কোনো লাভ নাই। দুঃখের সমুদ্রে কলার ভেলায় আমরা ভাসিতেছিলাম। হঠাৎ আপনার বিপুল অর্ণব-পোত আমাদের কাছে আসিল। উদ্ধার পাইবার আশা করি নাই, বরং মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল– তাহাই ফলিয়া গেল। আপনার জাহাজের ঢেউ লাগিয়া আমাদের কলার ভেলাখানি ডুবিয়া গেল। এখন তরঙ্গের সাথে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য পথ নাই। যতদিন শক্তি থাকিবে যুদ্ধ করিব।

আপনি কূলে উঠিয়াছেন। যাহারা তরঙ্গে ডুবিতেছে– তাহাদের লইয়া এ বিদ্রূপ কেন?

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯১

ইচ্ছা করলেই কি আপনার কূলে উঠিতে পারি? আপনি কি ভাবিয়া আমায় ডাকিয়াছেন, জানি না।

যে অধিকার আমার মা আপনাকে দিয়াছেন– সেই অধিকারের দাবি লইয়া যেদিন শুধু আপনি নন– আপনার অভিভাবিকা জননী আসিয়া ডাকিবেন– সেই দিন হয়তো যাইতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্বে নয়। লোক-সমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়া আপনার কাছে গেলে– আপনিই আমায় শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না। অন্তরে যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বাহিরের দিনের আলোকে তাহাকে স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যদি অর্জন করি, সেদিন আপনার আদেশে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়া দাঁড়াইতে পারিব।

আশা করি, আপনি আমার ভুল বুঝিবেন না। এবং আর এরূপ ছেলেমানুষিও করিবেন না। আমার আত্মসম্মান আপনার আত্মসম্মানের চেয়ে কোনো অংশ হীন বা কম নহে!

বাহিরের ঐশ্বর্যের দম্ভ আমার নাই, আমরা দরিদ্র; কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যের গৌরব আমার অন্তরে আপনার অপেক্ষা কম নাই।

আমাদের মাঝে যে অকূল পারাবার বহিয়া চলিল– তাহাই হয়তো আমার নিয়তি।

এ কূলে আপনি আসিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। ওকূল হইতে আজ হাতছানি দিয়া ডাকিবেন না। মানুষেরই তো মন, একবার যদি ঝাঁপাইয়া পড়ি প্রলোভনের বশে একূল ওকূল দুইকূলই হারাইব। মা আপনার জন্য এখানো কাঁদেন। বলেন, মীনা এসে চলে গেল! ও আর আসবে না! যদি উপযুক্ত চিকিৎসা হইত, মা হয়তো ভালো হইলেও হইতে পারিতেন।

এইবার বাবার আর দাদার পাগল হইতে বাকি, আপনার অনুগ্রহে হয়তো তাহারও আর বিলম্ব নাই।

আপনি কি জাদু জানেন? মোমি আর মোবারক আজও আপনার ওকালতি করে! দুটো কাপড় আর দু-হাঁড়ি সন্দেশের এমনই মোহ! চির দুঃখী কিনা!

আমাকে ভুলিয়াও যে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ; আরো ধন্যবাদ দিব, যদি স্মরণ করিয়া ভুলিয়া যান এবং এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি প্রেরণ না করেন। ইতি–

আপনার দয়া-ঋণী
তাহমিনা"৩১

ভূণীর এই দীর্ঘ চিঠি থেকে একজন নারীর ব্যক্তিত্ব আত্মমর্যাদাবোধ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কষ্টে কষ্টে সে জর্জরিত। তারপরও নারী ব্যক্তিত্ব আত্মসম্মান সে এতটুকু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নয়।

স্বদেশি বিপ্লববাদীদের উপর ব্রিটিশদের নির্যাতন। বজ্রপানি, প্রমত্ত, জাহাঙ্গীর প্রমুখ বিপ্লবীদের দ্বীপান্তরের শাস্তিদানের মধ্য দিয়েই এটি প্রকাশিত হয়েছে। বিপ্লবযুগ ছিল বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও নির্যাতনের যুগ। বিপ্লবীরা জানতেন ধরা পড়লে তাদের মৃত্যু কিংবা দ্বীপান্তরই একমাত্র শাস্তি। সুতরাং এ শাস্তির কথা জেনেই বিপ্লবীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল দেশমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। সমকালীন ব্রিটিশ নির্যাতনের সাদৃশ্য রয়েছে পিণাকী চরিত্রটির সাথে ক্ষুদিরাম বসুর। বিপ্লবী অপরাধে ক্ষুদিরাম বসুরও ফাঁসি হয়েছিল মাত্র আঠারো বছর বয়সে। পিণাকীর মতো সেও হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল ফাঁসির মঞ্চে। সমকালীন সমাজচিত্রের এটি একটি ঐতিহাসিক দর্পণ।

---

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩২৬

তথ্যনির্দেশ

১। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ২৫মে ২০০৬ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৩। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ৩য় খণ্ড, মার্চ ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নজরুলের ছোটগল্পে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা

নজরুলের অধিকাংশ ছোটগল্প আত্মকথামূলক। নায়ক নায়িকা নিজেরা নিজেদের কথা ব্যক্ত করেছে। গল্পগুলোকে ডায়েরিধর্মীও বলা যেতে পারে। নজরুল উপনিবেশ শৃঙ্খলিত লেখক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ থেকে শুরু করে স্বদেশি আন্দোলন, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব ইত্যাদি রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোর সাথে নজরুল কোথাও প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন কোথাও পরোক্ষ ছিলেন।

'দুরন্তপথিক' গল্পটিতে সমকালের সামগ্রিক একটি অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। এই অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য দুরন্ত পথিক ছুটে চলে সকল বাঁধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে। নজরুলের এ মানস সমকালকে গল্পে তুলে ধরেছেন এভাবে-

> "সে চলিতেছিল দুর্গম কাঁটাভরা পথ দিয়ে। চলিতে চলিতে সে একবার পিছন ফিরিয়া দেখিল, লক্ষ আঁখি অনিমিখে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। সে-দৃষ্টিতে আশা-উন্মাদনার ভাস্বর জ্যোতি ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। তাহাই ঐ দুরন্ত পথিকের বক্ষ এক মাদকতাভরা গৌরবে ভরপুর করিয়া দিল। সে প্রাণ-ভরা তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিল, 'হাঁ ভাই! তোমাদের এমন শক্তি-ভরা দৃষ্টি পেলে কোথায়?' অযুত আঁখির অযুত দীপ্ত চাউনি বলিয়া উঠিল– 'ওগো সাহসী পাথিক, এ দৃষ্টি পেয়েছি তোমারই চলার পথ চেয়ে!' উহারই মধ্যে কাহারো স্নেহ-করুণ চাউনি বাণীতে ফুটিয়া উঠিল,–'হায়! এ দুর্গম পথে তরুণ পথিকের মৃত্যু যে অনিবার্য।' অমনি লক্ষ কণ্ঠের আর্ত ঝঙ্কার গর্জন করিয়া উঠিল, 'চোপরাও ভীরু! এই তো মানবাত্মার সত্য শাশ্বত পথ।"[১]

'দুরন্তপথিক' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ১৯২০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'মোসলেম ভারত' শ্রাবণ সংখ্যায়। এটি 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের অষ্টম তথা শেষ সংযোজন। লেখকের ভাষাতেই রচনাটি 'কথিকা'।

সমকালীন সমাজের আবর্তে লেখকের কল্পনাপ্রসূত রচনা এটি। বলা যায় দুরন্তপথিক লেখকের কাল্পনিক প্রতিকৃতি। যে মুক্তির জন্য, সত্যের জন্য, কল্যাণের জন্য ছুটে চলে সমস্ত বাঁধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে। বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে

---

১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ফেব্রুয়ারী-২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২৯৮

এই উপমহাদেশে যে প্রচণ্ড অস্থিরতা, অস্থিতিশীলতা বিরাজমান ছিল সমাজের প্রতিটি স্তরে, দুরন্ত পথিকের মাঝে তারই প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটেছে বলা যায়।

'রিক্তের বেদন' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইংরেজি ১৯৩০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'নূর' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায়। এটি 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প। গল্পটি আত্মকথা বর্ণনামূলক। গল্পে নায়ক হাসিন তার প্রিয়তমার ভালোবাসাকে এড়িয়ে যাবার জন্য যুদ্ধে যোগদান করে। সেখানেও সে প্রেমে পড়ে এক বেদুইন মেয়ের। কিন্তু কোনো জায়গাতেই হৃদয়ের পূর্ণতা পায় না সে। শাহিদার বিয়ে এবং বেদুঈন কন্যা গুলের মৃত্যু হাসিনের হৃদয়ে যে রিক্ততা তৈরি হয়েছে তাই মূলত রিক্তের বেদন গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নজরুলের প্রথম রচনা এবং প্রথম ছোটগল্প। রিক্তের বেদন গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প এটি। ইংরেজি ১৯১৯ এবং ১৩২৬ বঙ্গাব্দের 'সওগাত' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম ছাপা হয়েছিল গল্পটি। গল্পের নামই হচ্ছে বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী। উনিশ বছরের এক তরুণের বাউন্ডেলে জীবনের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারুণ্যের অসম্ভব দুরন্তপনার জন্য তার বাবা তাকে গ্রামের স্কুল থেকে শহরের স্কুলে নিয়ে ভর্তি করেছেন। সেখানেও সে তৈরি করে দুরন্তপনার নতুন অঙ্গন। তবে ক্লাসে সে যথেষ্ট ভালো। এরই মাঝে বারো তেরো বছরের এক কিশোরীর সাথে বিয়ে হয় তার। ঘটনাক্রমে ঐ কিশোরী মৃত্যুবরণ করলে অভাবনীয় পরিবর্তন হয় তরুণের। ফলে মা তাকে পুনরায় বিয়ে দেন। তাতেও প্রথম স্ত্রী রাবেয়ার স্মৃতি ভুলতে পারে না সে। বিরহ কাতরতায় টেস্ট পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হতে পারেনি। এক পর্যায়ে বোর্ড সুপারিনটেন্ডেন্ট মশাই তাকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেন। এমন কুপুত্রকে বাবাও তাজ্যপুত্র করেন। কিছুদিন পর তরুণের দ্বিতীয় স্ত্রী সখিনাও মৃত্যুবরণ করে। তারও কিছুদিন পর তার মা মারা যান। রিক্ত হৃদয়ের যন্ত্রণা ভোলার জন্য শেষে তরুণ যুদ্ধে যোগদান করে এবং বাগদাদে গিয়ে মারা যায়।

'মেহের নেগার' 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের তৃতীয় গল্প। এটি ইংরেজি ১৯১৯ এবং বাংলা ১৩২৬ সালের 'নূর' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এটিও আত্মকথা বর্ণনামূলক গল্প। নায়ক য়ুসুফ বর্ণনা করেছে তার

হৃদয়ের রিক্ততার কথা। য়ুসুফের বাড়ি ওয়াজিরিস্থানের পাহাড়ে। ঝিলম নদীর তীরে বেড়াতে এসে গুলশন নামের এক তরুণীর প্রেমে পড়ে সে। তাকে সে মেহের নেগার বলে আখ্যায়িত করে। মেহের নেগারকে য়ুসুফ স্বপ্নে দেখে ভালোবেসেছিল। গুলশনের সাথে তার সেই স্বপ্ন মানসীর হুবহু মিল খুঁজে পেয়ে তাকে সে মেহের নেগার বলে গ্রহণ করে। কিন্তু গুলশন য়ুসুফের ভালোবাসাকে তার জীবনে অবাঞ্ছিত মনে করে এবং সে আত্মহত্যা করে। কারণ গুলশনের সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত লজ্জাজনক। তার মা রূপজীবিনী। শেষে য়ুসুফ তার শূন্য হৃদয়ের বেদনা ঘুচাবার জন্য দেশের তরে জীবন উৎসর্গ করে। যুদ্ধে যোগ দেয় সে।

'রাক্ষুসী' গল্পটি ইংরেজি ১৯২০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'সওগাত' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। 'রিক্তের বেদন' গল্পগ্রন্থের পঞ্চম সংযোজন এটি। আত্মকথা বর্ণনামূলক গল্প এটিও। এক নারী এখানে বর্ণনা করেছে তার অভিশপ্ত জীবনের কথা। সমকালীন একটি নিটোল সমাজের চিত্রের পটভূমিতে রচিত হয়েছে গল্পটি। গল্পে পাঁচুর বাপ অর্থাৎ রাক্ষুসীর স্বামী অতি সহজ সরল মানুষ। স্ত্রী বিন্দি। সে রাক্ষুসী নামে এক সময় পরিচিতি লাভ করে গ্রামে। তাদের এক ছেলে দুই মেয়ে। সুখী সংসার। কিন্তু এরই মাঝে স্বামী পরকীয়া প্রেমে পড়ে একেবারে বিয়ের প্রস্তুতি নেয়। বিন্দি তখন কোনো উপায়ান্তর না দেখে স্বামীকে খুন করে। সাত বছরের জেল হয় বিন্দির। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরেই সে রাক্ষুসী নামে পরিচিত হয়। গ্রামের সবাই তাকে ভয় করে। নানা অপবাদে জর্জরিত করে। যার জন্য তার মেয়ের বিয়ে হয় না।

'সালেক' গল্পটি 'রিক্তের বেদন' গল্প গ্রন্থের ষষ্ঠ গল্প। গল্পটি ইংরেজি ১৯২০ এবং বাংলা ১৩২৭ সালের 'বকুল' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষাতে বর্ণিত হয়েছে গল্পটি। সমকালীন সমাজের চিত্র এতে থাকলেও আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়াও এখানে রয়েছে। হঠাৎ করেই এলাকায় এক দরবেশের আবির্ভাব ঘটে। সবাই ছুটে যায় দরবেশের কাছে। তার পাদপদ্মে উৎসর্গ করতে চায় নিজেকে। কিন্তু দরবেশ নিরুত্তর। খবর পৌঁছে শহরের কাজির কাছে। সেও ছুটে আসে। দরবেশকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। শেষে দরবেশ এই নাছোড়বান্দা কাজির প্রতি সদয় হন। তাকে উপদেশ দেন আগামীকালের

জুম্মার নামাজের ইমামতি করার সময় দুবগলের নিচে দুইটি মদের বোতল নিয়ে দাঁড়াতে। তারপর নামাজ পড়ার সময় সেই মদের বোতল দুটি জায়নামাজে ভেঙ্গে দিতে। দরবেশের নির্দেশে কাজি সাহেব তাই করলেন এবং এই গুরুতর অপরাধের জন্য শাস্তি পেলেন পদ এবং পদবি হারিয়ে।

উল্লেখ্য সমকালীন সমাজের যে প্রতিফলন এই গল্পে ঘটেছে তাহলো পির, ফকির, দরবেশের প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্বলতা, যে দুর্বলতার কাছে হার মানে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও। দরবেশের প্রতি কাজি সাহেবের এই যে আসক্তি এবং সমাজে নিরপরাধ ও নিরীহ মানুষের প্রতি কাজি সাহেবের যে অন্যায় অবিচারের চিত্র তা নজরুল সমকালীন সমাজ থেকে তুলে আনলেও এ চিত্র সর্বকালের সমাজের চিত্র।

'স্বামীহারা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ ইংরেজি এবং বাংলা ১৩২৬ সালের 'সওগাত' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায়। 'রিক্তের বেদন' গ্রন্থের সপ্তম গল্প এটি। সমকালীন নিটোল সামাজিক পটভূমির উপর রচিত এই গল্পটি আত্মবর্ণনামূলক। পড়শী বোন সলিমার কাছে স্বামীহারা বেগম বর্ণনা করেছে তার অভিশপ্ত নারী জীবনের কাহিনি। সমাজের কাছে স্বামীহারা এক নারীর আর্তনাদ এই কাহিনি। বেগম অতি নিম্নঘরের এক মেয়ে। বাবা, মা ও অপর তিন ভাই বোনের সুখের সংসার তার। ছোট বেলাতেই তিন ভাইবোন এবং বাবা মারা যায়। মৃত্যুশয্যায় মা একমাত্র সন্তান বেগমকে নিয়ে বিপাকে পড়লে দয়ার হাত বাড়িয়ে দেন তার সই মা। সই মা তার বি এ পাস ছেলের পুত্রবধূ করেন বেগমকে। কিন্তু অতি উচ্চ বংশ এবং প্রভাবশালী ঘরে নিচু বংশের গরিব ঘরের বেগমের বিয়েকে সহজভাবে মেনে নিতে পারে না চারপাশের লোকজন। কিন্তু কান দেয় না বেগমের স্বামী, শাশুড়ি। সুখের জোয়ারে ভেসে যায় বেগম। এর মাঝেই বেগমের মা মারা যান। এলাকায় মহামারী আকারে দেখা দেয় কলেরা। জনসেবা করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে বেগমের স্বামী। সাথে সাথে শাশুড়িও ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। এরপর বেগমকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হয়। তারপর সমাজের নিষ্পেষণে পাগল হয়ে যায় বেগম। কাজেই বলা যায় সমাজের নিম্নশ্রেণির নারীরাই সমাজের নির্যাতনের শিকার বেশি হয়। কারণ এরা পুরোমাত্রায় অবলা। পুরুষের বলই তাদের বল। বেগমের ভাষায়,

"খোদা যেন মেয়েদের বিধবা করবার আগে মরণ দেন, তা নাইলে তাদের বে-হবার আগেই যেন তারা 'গোরে' যায়। [...] [...] আমার বিয়ের মতো এত বড় একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডে গ্রামময় মহাহুলস্থুল পড়ে গেল। বংশে নিকৃষ্ট, সহায়-সম্বলহীন আমাদের ঘরে সৈয়দ বংশের বি. এ. পাশ করা সোনার চাঁদ ছেলের বিয়ে হওয়া ঠিক যেন রূপকথার ঘুঁটে কুড়োনির বেটির সাথে বাদশাজাদার বিয়ের মতোই ভয়ানক আশ্চর্য ঠেকছিল সকলের চোখে। [...] [...] যখন তাঁর লাশ কাঁধে করে বাইরে আনা হলো তখন ওদের কে একজন আত্মীয় আমার চুল ধরে বললে, 'যা শয়তানি, বেরো ঘর থেকে এখনি।"[২] বেগমের এই বর্ণনায় সামজিক নিষ্পেষণের নিম্নশ্রেণির একজন নারীর এই যে আর্তনাদ তা শুধু একজন বেগমেরই শুধু নয়। নির্যাতিত নিষ্পেষিত সকল নারীর।

'পদ্ম গোখ্‌রা' শিউলিমালা গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প। গল্পটি নজরুল সরাসরি গ্রন্থেই অন্তর্ভুক্ত করেন। সমকালীন সমাজচিত্র ছাড়াও গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত এবং লোক প্রচলিত আখ্যানেরও চিত্র পাওয়া যায়। গল্পটির সারসংক্ষেপে দেখা যায়, জোহরা নামের এক অপূর্ব রূপবতী কন্যাকে একমাত্র পুত্র আরিফের পুত্রবধূ করার সাথে সাথেই রসুলপুবের পির সাহেবদের হারিয়ে যাওয়া জমিদারি পুনরায় ফিরে আসে। বধূ পয়মন্ত হয়ে ওঠে সবার কাছে, সেই সাথে তার আদরের সীমা ছাড়িয়া যায়। বাড়ির পুরানো প্রাচীরের ফাটল থেকে জোহরা আবিষ্কার করে গুপ্তধন। সেই গুপ্তধনে আরিফ কলকাতায় কয়লার ব্যবসা করে লাভবান হয় আশাতীতভাবে। পুরনো জমিদারি ফিরে পায়। এদিকে জোহরাকে নিয়েও তারা পড়ে এক চরম বিপাকে। গুপ্তধন উদ্ধারের সময় সেখান থেকে বের হয়ে আসে দুটি পদ্ম গোখরা এবং সেই পদ্মগোখরা ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয় জোহরার দিকে। জোহরাও মাতৃস্নেহে আদর করে, তাদের বাটিতে করে দুধ খাওয়ায়।

উল্লেখ্য বিয়ের এক বছরের মধ্যেই জোহরার দুটি যমজ সন্তান হয়ে আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। জোহরা এই সাপ দুটির মাঝে সেই মৃত সন্তানদের খুঁজে ফেরে আর তার মাতৃজ্বালা প্রশমন করে। ক্রমে জোহরা এবং সাপদের এই অস্বাভাবিক আচরণে বাড়ির সকলে ভয়ে বিরক্ত হয়ে জোহরাকে বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয় কুতুবপুরে। জোহরা চলে যাবার পর সাপ দুটিও দু'দিন বাড়িময় ভীষণ উৎপাত করে

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ.-২৯১-২৯২

অন্তর্ধান হলো। বাবার বাড়িতে জোহরার অবস্থানের ছয় মাস অতিক্রম করার পরও জামাই নিয়ে যাবার নাম না করলে এবং জোহরার শরীরেরও দিন দিন অধঃপতন ঘটলে জোহরার মা নিজেই জামাইকে বলে জোহরাকে কলকাতায় বা শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ঠিক হয় পরদিন আরিফ কলকাতায় নিয়ে যাবে জোহরাকে। আর সে রাতেই ঘটে অঘটন। জোহরা বাবার বাড়ি আসার সময় প্রায় বিশ হাজার টাকার গহনা পরে এসেছিল। রাতে চুরি হয় সব গহনা। দুভার্গ্যবশত ডাকাত দু'জন চলে যরার সময় চন্দ্রালোকে তাদের মুখ দেখতে পায় আরিফ। ডাকাত ওরই প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর পিতা-মাতা দেখে লজ্জায়, ঘৃণায় জর্জরিত হয় আরিফ। তার উপর চোরের মার বড় গলা। ঘুম না ভাঙতেই তাদের আচরণে আরো ক্ষুব্ধ হয় আরিফ। বাড়ির আর জল স্পর্শ না করে চলে যেতে চাইলে জোহরার মার মিনতিতে সে খেয়ে যেতে রাজি হয়। শেষে আরিফকে তারা বিষ খাইয়ে মারতে চায়। রক্তবমি করতে করতে আরিফ কোনোরকমে কলকাতায় ট্রেনের প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠে বসে। সেই কামরাতেই একজন ডাক্তারের উপস্থিতি ছিল বলে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে যায় আরিফ। ওদিকে আরিফ চলে আসার পর জোহরা মাকে রাক্ষুসী বলেই মূর্ছিত হয়ে পড়ে। তিনদিন তিনরাত জোহরা একেবারেই অভুক্ত থাকলে বাবা তাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে নিজেরাও মক্কা যাত্রা করেন। আরিফ বাড়ি ফিরে যাবার পরই জোহরাও পৌঁছায়। জোহরা স্বামীর পায়ে আছড়ে পড়েই মূর্ছা যায়। এত কিছুর মাঝেও জোহরা ভুলতে পারেনি তার পদ্মগোখরাদের।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা জোহরার বাবা লুকিয়ে জোহরাকে দেখতে এলে তাদের চাকরানি ভূত বলে চিৎকার করে ওঠে। এদিকে জোহরারও ওঠে প্রসব ব্যথা। চাকরানির ভূত ভূত বলে চিৎকারে গদ্মগোখরা তাড়া করে ভূতকে। ফলে পদ্মাগোখরার কামড়ে মারা যায় জোহরার বাবা এবং জোহরার বাবার প্রহারে মারা যায় পদ্মগোখরা। আরিফের মুখে জানা যায় মক্কা যাওয়ার পথে জোহরার মা রাস্তায় কলেরায় মৃত্যুবরণ করে। পরদিন সকালবেলা গ্রামে রটে যায় জোহরা দুটি মৃত সাপ প্রসব করে মারা যায়। 'পদ্মগোখ্‌রা' গল্প সম্পর্কে নজরুল অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখরের অভিমতটি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন–

"আসলে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি মানুষের গভীর মনোযোগ প্রাণীকুলকে যে দ্বেষ ভুলিয়ে দিতে পারে এমন বাণী, পাশাপাশি এই সংযোগ হঠাৎ ছিন্ন হলে মানুষ যে মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিকারগ্রস্ত হতে পারে– সেই বার্তাবহ এই গল্প।"[৩] এই মন্তব্যটি যথার্থ।

গল্পটিতে সামাজিক আবহ রয়েছে। সমকালীন সমাজের চিত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। অভাব মানুষকে কতটা নীচতায় পৌঁছে দিতে পারে তা জোহরার বাবা-মার আচরণে ফুটে ওঠে। অভাবের তাড়নায় তারা মেয়ের গহনা চুরি করে রাতের অন্ধকারে। অথচ জামাই তাদের আর্থিক সাহায্য করতে চাইলে তারা আত্মসম্মানবোধে তা নেননি।

জমিদারদের সমকালীন একটি চিত্র ফুটে উঠেছে গল্পে এভাবে,

"তাঁহারা খড়মে পর্যন্ত সোনার ঘুঙুর লাগাইতেন। বর্তমানে মীর সাহেবের পিতামহ নাকি স্নানের পূর্বে তেল মাখাইয়া দিবার জন্য এক গ্রোস যুবতী সুন্দরী ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।"[৪]

এসব সামাজিক চিত্রগুলো সমকালীন।

'জিনের বাদশা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯৩০ বাংলা ১৩৩৭ সালের 'সওগাত' পত্রিকার বৈশাখ-জৈষ্ঠ্য সংখ্যায়। 'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প এটি। গল্পের পটভূমি হচ্ছে ফরিদপুর জেলায় আড়িয়াল খাঁ নদীর ধারের মোহ-নপুর গ্রাম। যার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান এবং চাষি। কয়েক ঘর কায়স্থও আছে, তবে তারা মুসলমানদের ধারে কাছে ঘেঁষে না। গ্রামের মুসলমানদের মাতব্বর চুন্নু ব্যাপারী। তার তিন স্ত্রী এবং সাত ছেলে। চুন্নু ব্যাপারী নিজ হাতে চাষ করে এবং তাতে সাহায্য করে তার সাত ছেলে ও তিন স্ত্রী।

আল্লা-রাখা ওরফে 'কেশরঞ্জন বাবু' চুন্নু ব্যাপারীর তৃতীয় স্ত্রীর তৃতীয় সন্তান। আল্লা-রাখা অসম্ভব ডানাপিঠে। একই গ্রামের নরদ আলী শেখের মেয়ে চানভানুকে ভালোবাসে সে। চানভানু নারদ আলির একমাত্র সন্তান। তাদের অবস্থা ভালো। এর মাঝেই চানভানুর বিয়ে ঠিক হয়ে যায় পাশের গ্রামের ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে। এই সংবাদে আল্লা-রাখা মরিয়া হয়ে ওঠে চানভানুকে

---

৩. ড. সৌমিত্র শেখর, ছোটগল্প ॥ ভূমিকা, কাজী নজরুল ইসলাম-এর ছোটগল্প, ২০১৭, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ.-১৪

৪. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-৪র্থ খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৩৫৭

বিয়ে করার জন্য। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। জিনের বাদশা সেজে চানভানুর বাবার কাছে দৈব চিঠি প্রেরণ করে। কিন্তু কিছুতেই ঠেকাতে পারে না বিয়ে। কারণ কন্যার বাবা জিনের বাদশার দৈব চিঠিকে বিশ্বাস করলেও বরের বাবা তা করতে রাজি হয়নি। তার কারণও ছিল। তা হচ্ছে:

> "আসল কথা ছেরাজ অতিমাত্রায় ধূর্ত ও বুদ্ধিমান। সে বুঝেছিল, চানভানু বাপ-মার একমাত্র সন্তান, তার উপর সুন্দরী বলে কোনো বদমায়েস লোক সম্পত্তি আর মেয়ের লোভে এই কীর্তি করছে। অবশ্য, ভূত যে ছেরাজ বিশ্বাস করত না, বা তাকে ভয় করত না– এমন নয়, তবে সে মনে করছিল, যে লোকটা এই কীর্তি করছে– সে নিশ্চয় টাকা দিয়ে কোনো পিশাচ-সিদ্ধ লোককে দিয়ে এই কাজ করাচ্ছে। কাজেই বিয়ে হয়ে গেলে অন্য একজন পিশাচ সিদ্ধ গুণীকে দিয়ে এ সব ভূত তাড়ানো বিশেষ কষ্টকর হবে না! এত জমির ওয়ারিশ হয়ে আর কোনো মেয়ে তার গুণধর পুত্রের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে!"[৫]

অবশেষে চানভানুর বিয়ে হয়ে যায় ছেরাজ হালদারের ছেলের সাথে। এরপরই আল্লারাখার মাঝে ঘটে অভাবনীয় পরিবর্তন। তার ডানপিঠে ভাব থেকে পুরোপুরি শান্ত, ধীর, স্থির জীবনে ফিরে আসে সে। লাঙল কাঁধে নিয়ে বাবার সাথে জমিতে হাল ধরতে রওনা হয়।

এটা হলো জীনের বাদশা গল্পের কাহিনি সংক্ষেপ। গ্রামের সহজ সরল সুখ দুঃখ ভালোবাসা নিয়ে গল্পটি রচিত। লোককথার সুর পাওয়া যায় আল্লারাখা চানুভানুর ভালোবাসায়।

'অগ্নি-গিরি' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯৩০ এবং বাংলা ১৩৩৭ সালের 'সওগাত' পত্রিকার ভাষা সংখ্যায়। শিউলিমালা গ্রন্থের তৃতীয় সংযোজন এটি। গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত গল্পটি। একদল দামাল ছেলের দুর্দান্তপনা নিরীহ একটি ছেলের প্রতি এবং এক তরুণীর নীরব ভালোবাসার জবাব দিতে হঠাৎ নিরীহ ছেলেটির অগ্নিগিরির মতো জ্বলে ওঠা এবং শেষ পর্যন্ত জেলে অন্তরীণ হয়ে দীর্ঘ সাত বছরের কারদণ্ড ভোগ গল্পটির সংক্ষিপ্ত চিত্র। গল্পে নিরীহ জায়গীর সবুর আখন্দ-এর সাথে নজরুলের জায়গীর জীবনের একটি বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায়।

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮৪

নজরুল ত্রিশালের কাজীর শিমলা গ্রামে কাজী সাহেবদের বাড়িতে জায়গীর থেকে নিকটবর্তী দরিরামপুর স্কুলে পড়েছেন। ঐ গ্রামে নজরুলের বিশেষ কোনো বন্ধু বান্ধব ছিল না এবং সুযোগ পেলেই গ্রামের বখাটে দামাল ছেলেরা নজরুলকে জ্বালাতন করত। এ দৃশ্য সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার ধারক।

'শিউলিমালা' গল্পগ্রন্থের শেষ গল্প 'শিউলিমালা'। বিরহকাতর প্রেমের গল্প এটি। গল্পের নায়ক আজহার তরুণ ব্যারিস্টার এবং ভালো দাবাড়ু। নায়িকা শিউলি। শিউলির বাবা রিটায়ার্ড প্রফেসর চৌধুরী। তিনিও ভালো দাবাড়ু। আজহার ব্যারিস্টারি পাস করে শিলং বেড়াতে গেলে সেখানে তাদের সাথে পরিচয়, সখ্য এবং হৃদ্যতা দাবা খেলার সূত্র ধরেই। শিউলিদের বাড়িতে আজহারের যথেষ্ট আপ্যায়ন এবং শিউলির সাথেও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এক মাস শিউলিদের বাড়িতে থাকার পর আজহার যখন চলে আসার জন্যে প্রস্তুতি নেয় তখনি সে বুঝতে পারে তার প্রতি শিউলির গোপন অনুরাগ।

> "আচ্ছা ভাই শিউলি, আবার যখন ।এমনি আশ্বিন মাস– এমনি সন্ধ্যা আসবে– তখন কি করব বলতে পারো?" শিউলি তার দু'চোখ ভরা কথা নিয়ে আমার চোখের উপর যেন উজাড় করে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল– "শিউলি ফুলের মালা নিয়ে জলে ভাসিয়ে দিও।"
>
> আমি নীরবে সায় দিলাম, "তাই হবে।" জিজ্ঞাসা করলাম–"তুমি কি করবে?" সে হেসে বলল– "আশ্বিনের শেষে তো শিউলি ঝরেই পড়ে।"[৬]

সমকালীন কোনো সমাজচিত্র এতে ফুটে ওঠেনি। তবে দাবা যে তখন মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তের একটি অতিপ্রিয় খেলা ছিল তা বুঝা যায়।

অতুলনীয় জীবন বৈচিত্র্য ও বিপুল সৃষ্টি সম্ভার নিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এক নবতর স্রোতের সৃষ্টি করেছিলেন। কিশোরে লেটোর দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে তাঁর সাহিত্যচর্চার যে সূচনা, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ধারাবাহিকভাবে তা চলেছিল গুরুতর অসুস্থ হয়ে কর্মদক্ষতা না হারানো পর্যন্ত

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪১০

(১৯৪২)। জীবিতকালেই সাহিত্যিক ও সংগীতকার রূপে অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন নজরুল। কিন্তু তিনি খুব সুগোছালো মানুষ ছিলেন না, তাই তাঁর রচনার ক্ষেত্রেও অনেক সময়ই বিষয়টি প্রযোজ্য। তিনি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম যুগস্রষ্টা। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যে তাঁর দক্ষতা অপরিসীম, তিনি বিদ্রোহী চেতনার এক অসামান্য প্রতিভূ, সমাজ সংস্কৃতির অন্যতম মহান নির্মাতা, জাতীয় জাগরণের অগ্রপথিক ও স্বাধীনতার চারণকবি, সর্বধরনের সংকীর্ণতা ও কুসংস্কার, শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামী সৈনিক, ব্রিটিশের কারাগারে গিয়েও তিনি স্বাধীনতার এবং শিকল ভাঙার গান গেয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-২য় খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২. ড. সৌমিত্র শেখর, ছোটগল্প ॥ ভূমিকা, কাজী নজরুল ইসলাম-এর ছোটগল্প, ২০১৭, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা।
৩। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-৪র্থ খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নজরুলের প্রবন্ধ ও অভিভাষণে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা

কাজী নজরুল ইসলাম প্রদত্ত অভিভাষণের সংখ্যা কম হলেও অধিকাংশ অভিভাষণ সাহিত্যিক গুণসমৃদ্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য।

নজরুলের অভিভাষণসমূহ 'নজরুল রচনাবলী' ৪র্থ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে (পৃ.৮৭- ১২৯)। এতে মাত্র ১৪টি অভিভাষণ স্থান পেয়েছে।[১]

আমরা জানি, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত নজরুলের অভিভাষণ (এবং চিঠিপত্র) সংগ্রহ ও সংকলনে কবি আবদুল কাদিরই প্রথম উদ্যোগী হন। তিনি তাঁর সম্পাদিত 'রচনা সম্ভার' গ্রন্থে নজরুলের বারোটি অভিভাষণ প্রকাশ করেন (আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' ১ম সংস্করণ ২৫ মে ১৯৬১)। প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে আবদুল কাদির আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন:

> "এ সংকলনে কবির ১২টি 'অভিভাষণ' পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু কবি আরও বহু অনুষ্ঠানে বাণী ও ভাষণ দিয়েছিলেন, হয়ত নানা পত্রিকাতে সেগুলি মুদ্রিতও হয়েছিল। সে-সব অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তরা সহযোগিতা করলে সেগুলি সহজেই সংগৃহীত হতে পারে।"[২]

'নজরুল রচনাবলী' নতুন সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডে এ পর্যন্ত যে বারোটি অভিভাষণ স্থান পেয়েছে সেগুলি হলো:

(১) প্রতিভাষণ (২) তরুণের সাধনা (৩) প্রতি-নমস্কার (৪) মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা (৫) বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও (৬) জন-সাহিত্য (৭) উস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁ (৮) স্বাধীন জাগরণ (৯) শিরাজী (১০) আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ (১১) মধুরম্ (১২) যদি আর বাঁশি না বাজে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অভিভাষণের এই শিরোনামগুলো কবির দেয়া শিরোনাম নয়। এগুলো বিভিন্ন সংগ্রাহক অথবা নজরুল রচনাবলি সম্পাদক আব্দুল কাদির প্রদত্ত। আরও উল্লেখ্য যে, অভিভাষণগুলো কালানুক্রমিক বিন্যস্ত নয়।

---

১. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, নানা প্রসঙ্গে নজরুল, ২০০২, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, পৃ.-১৭৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৪

এখন আমাদের আলোচ্য প্রথম অভিভাষণ- 'প্রতিভাষণ'

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে জাতির পক্ষ থেকে কাজী নজরুল ইসলামকে যে সংবর্ধনা দেয়া হয়, সে সংবর্ধনা-সভার সভাপতি ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। 'নজরুল সম্বর্ধনা সমিতির পক্ষ থেকে মানপত্র পাঠ করেন এম. ওয়াজেদ আলী। এই মানপত্রের উত্তরে নজরুল প্রদত্ত ভাষণটি রচনাবলিতে 'প্রতিভাষণ' শিরোনামে চিহ্নিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক সওগাতে' এর শিরোনামে ছিল 'কবির উত্তর'।

সুন্দরের সাধনাই যে কবির জীবনাদর্শ, এ কথা এই অভিভাষণে বারংবার উচ্চারিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন–

"সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা আমার ধর্ম"।[৩]

এই সুন্দরকে তিনি 'যুদ্ধভূমিতে' দেখেছেন 'কারাগারের' অন্ধকার কূপে দেখেছেন এবং ফাঁসির মঞ্চেও তাকে দেখেছেন। তাই কবির গান সেই সুন্দরকে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

কবির দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি একদিকে যেমন প্রশংসার ফুলপাতা পেয়েছেন, অন্যদিকে সমালোচনা ও 'নিন্দার বালি কাদা মাটি'ও তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, এই প্রতিভাষণে কবির বিরূপ সমালোচনা বিক্ষুব্ধ চিত্তের বেদনাও প্রকাশ পেয়েছে। কবির রচনা কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়, কোনো দল বা সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নয়। একথাই তিনি এ প্রতিভাষণে বলতে চেয়েছেন:

"যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন, তাঁদের মত হলুম না বলে তাঁদেকে আকাশের পাখিকে বনের ফুলকে গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই, এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের।"[৪]

'তরুণের সাধনা' শীর্ষক অভিভাষণটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ নভেম্বর সিরাজগঞ্জের নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে'র

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৮

সভাপতিরূপে প্রদান করেন। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আসাউদ্দৌলা শিরাজী এবং সেক্রেটারি ছিলেন এম. সিরাজুল হক।[৫]

সাধারণত কোনো বক্তৃতা বা অভিভাষণে শিরোনাম থাকে না। এই অভিভাষণেও সম্ভবত মূলে কোনো শিরোনাম ছিল না। কারণ 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় মুদ্রিত ভাষণ এবং নজরুল রচনাবলির অন্তর্ভুক্ত ভাষণের শিরোনাম অভিন্ন নয়। সাম্যবাদী পত্রিকায় মুদ্রিত অভিভাষণে বিভিন্ন অনুচ্ছেদেরও শিরোনাম রয়েছে। যেমন গোঁড়ামি কুসংস্কার অবরোধ ও স্ত্রী শিক্ষা, সঙ্গ একনিষ্ঠতা সঙ্গীত শিল্প, শেষ কথা। মুদ্রিত অভিভাষণে অনুচ্ছেদ শিরোনাম ছিল কিনা আমাদের জানা নেই, তবে নজরুল রচনাবলিতে মূল মুদ্রিত অভিভাষণেরই পাঠ গৃহীত হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। তাছাড়া 'সাম্যবাদী' পত্রিকার অভিভাষণে কিছু পাঠভেদও পরিলক্ষিত হয়। যেমন 'সাম্যবাদী'তে একটি চরণ ছিল 'আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল।' নজরুল রচনাবলিতে গৃহীত আছে 'আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল।'[৬]

সিরাজগঞ্জের সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নজরুল ইসলামের সহযাত্রী ছিলেন কবি সুফী জুলফিকার হায়দার ও কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দিন। এরা দুজনেই পরবর্তীকালে তাঁদের স্মৃতিকথায় সিরাজগঞ্জের এই সম্মেলনের বিবরণ দিয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, নজরুল খদ্দরের পায়জামা খদ্দরের শেরওয়ানি আর খদ্দরের টুপি পরে তাঁর অভিভাষণ প্রদান করেন। সমকালীন 'জাগরণ' (১৯৩২) পত্রিকায় কবির অভিভাষণ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়:

'সেদিন বিশাল জনতার সম্মুখে নজরুল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন মনে হয় সেটি ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ, এই একটি মাত্র অভিভাষণে নজরুলের সমগ্র জীবনাদর্শ বিধৃত হয়ে আছে।'

প্রকৃতপক্ষে, এটি নজরুলের একটি অনন্য-সুন্দর অভিভাষণ। অভিভাষণের সম্বোধন–'আমার প্রিয় তরুণ ভ্রাতৃগণ'।[৭] প্রায় সমগ্র অভিভাষণেই তিনি তারুণ্য ও যৌবনের জয়গান গেয়েছেন। আমরা জানি, নজরুল বিভিন্ন সময়ে তাঁর বিভিন্ন

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৮
৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৮ ও ১৭৯
৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৯

রচনায়, কবিতায় এবং গানে এই যৌবনকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। কবি নিজেই এই অভিভাষণে বলেছেন:

> "তারুণ্যকে-যৌবনকে আমি যেদিন হইতে গান গাহিতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতে বারে বারে সালাম করিয়াছি, তাজিম করিয়াছি, শ্রদ্ধা নমস্কার নিবেদন করিয়াছি। মানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি, স্তব রচনা করিয়াছি।"[৮]

এই অভিভাষণের বিশিষ্টতা হচ্ছে যে, কবি এখানে সমাজ-সচেতনতার বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, বাঙালি মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার প্রধান কারণ গোঁড়ামি ও কুসংস্কার। যাদের ফতোয়ায় থাকে 'বিবি তালাক ও কুফ্‌রি ফতোয়া'। তাদের সম্পর্কে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন– "এই ফতুয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরিবদের বাঁচাইতে পারবে সে তরুণ।"[৯]

নজরুল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, সমাজের অগ্রগতির পথে 'মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যাচল, তার চেয়েও বড় অন্তরায় হচ্ছে অবরোধ প্রথার ন্যায় 'হিমাচল'। অবরোধ প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন– "আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না– সর্ব্ব প্রথম মুসলমান নর নহে- নারী"।[১০]

গান গাওয়া অথবা সংগীতচর্চায় বিধি নিষেধ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

> "গান গাওয়াই যাহার স্বভাব, সেই গানের পাখিকে কোন অধিকারে গলা টিপিয়া মারিতে যাইবে? সুন্দরের সৃষ্টির শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার সৃষ্টি হেরিয়া কুফরির ফতোয়া দিবে?"[১১]

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম সফরে যান। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে এবং আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি হবিবুল্লাহ বাহারদের বাড়িতে প্রথম আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দেও তিনি চট্টগ্রামের ঐ বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন। ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের গোড়ার দিকে 'চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটি'র পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে এক

---

৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৯
৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৭৯
১০. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮০
১১. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮০

সংবর্ধনা দেয়া হয়। এই সংবর্ধনা সভায় কবিকে যে মানপত্র দেয়া হয়, তার উত্তরে তিনি 'প্রতি নমস্কার' শীর্ষক অভিভাষণ প্রদান করেন। এই অভিভাষণেও নজরুল তরুণদের উদ্দেশ্য করে তারুণ্যের অভিনন্দন বাণী শুনিয়েছেন। তিনি লিখেছেন– 'আমি গানের পাখি, অন্যাগত অরুণোদয়ের স্পন্দন আমার কণ্ঠে গান হয়ে ফুটে উঠেছে– সরাইখানার ঘুমন্ত মুসাফির, জাগো! সূর্যোদয়ের আর দেরি নেই, বন্ধু জাগো'।[১২]

নজরুল রচনাবলির পরবর্তী অভিভাষণ 'মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা'ও ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে প্রদত্ত হয়। অভিভাষণটির পরিচিতি প্রসঙ্গে আবদুল কাদির জানিয়েছেন যে, চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নজরুল এই অভিভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটি কোন তারিখে হয়েছিল এ তথ্য এবং অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়নি। এই অভিভাষণের শুরুতে নজরুল মরহুম আব্দুল আজিজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, কারণ তিনি এই মুসলমান শিক্ষা সমিতির স্বপ্নদ্রষ্টা। অভিভাষণের শেষ দিকে নজরুল চট্টগ্রামকে ঘিরে 'কালচারাল সেন্টার' প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করেন। প্রসঙ্গত নজরুল মুসলিম সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজনে আরবি- ফারসি বা উর্দু জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বারস্থ হতে বলেছেন, 'ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিংগি রূপে' দেখতে তিনি নারাজ। অভিভাষণটি 'বুলবুল' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৪৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩]

১৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিরূপে নজরুল যে অভিভাষণ দিয়েছিলেন, তারই শিরোনাম 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও'। এই অভিভাষণে নজরুল তরুণদের জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন। শিক্ষায়তনের পবিত্রতা রক্ষা প্রসঙ্গে বলেন:

> তোমাদের শিক্ষায়তন– তা স্কুলই হোক, আর কলেজই হোক, আর মাদ্রাসাই হোক– পীরের দর্গার চেয়েও পবিত্র, মসজিদের মতই পাক। এর অঙ্গনে যে দীক্ষা গ্রহণ কর, যে নিয়ত কর, জীবনে যদি সে ব্রত ফলপ্রসূ না হয়, তবে কাজ কি এই জীবনের এক তৃতীয়াংশ বাজে খরচ করে?[১৪]

---

১২. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮০
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮১
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮১

এই অভিভাষণটি অন্য কোথাও বা কোনো পত্রিকায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল কি না জানা যায়নি।

'জন সাহিত্য' ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা ৫ নং ম্যাঙ্গো লেনে দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিস গৃহে, 'জন সাহিত্য সংসদের' শুভ উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত অভিভাষণ।

'জন সাহিত্য' কী এবং প্রকৃতিই বা কীরূপ সে সম্পর্কে কবি অভিভাষণের শুরুতেই বলেছেন–

> "জন সাহিত্যের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মতবাদ সৃষ্টি করা এবং তাদের জন্য রসের পরিবেশন করা। সাময়িক পত্রিকাগুলোর দ্বারা আর তাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দ্বারা কিছুই হবে না। সম্পাদকীয় মত উপর থেকে উপদেশের শিলাবৃষ্টির মত শোনায়। তাতে জনগণের মনের উপর কোন ছাপ পড়ে না - জনমতও সৃষ্টি হয় না।[১৫]

'যাদের গ্রামের অভিজ্ঞতা আছে', তাদের উদ্দেশ্য করে কবি উপদেশ দিয়েছেন,

> "তাদের মতো করে তাদের কথা, তাদের গল্প বলুন– চাষারাও আয়না রাখে– নিজেদের চেহারা যদি তার মধ্যে দেখতে পায় তবে যত্ন করে রাখে"।[১৬]

নজরুল এ অভিভাষণে তাঁর নিজের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন:

সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে।

'উস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁ' অভিভাষণটি সংগীত শিল্পী উস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁর মৃত্যুতে প্রদত্ত শোকভাষণ। নজরুল তাঁর এই অভিভাষণে উস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁর স্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে জমির উদ্দীনের পরিচয় দিয়েছিলেন এইভাবে:

---

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮২
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮২

"জমির উদ্দীন খান সাহেব ছিলেন খান্দানি গাইয়ে। তিনি ঠুংরী সম্রাট। উস্তাদ মইজুদ্দীন খানের পর তাঁর মত ঠুংরী গাইয়ে আর কেউ ছিলেন না, এখনত নাই-ই। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্‌পা, গজল, দাদ্‌রা, সব সুরেই তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত।"[১৭]

'স্বাধীন চিত্ততার জাগরণ' শীর্ষক অভিভাষণটি ১৩৪৭ সালে কলিকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। ঈদ উপলক্ষে আয়োজিত এই সম্মেলনে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের সমাবেশ ঘটে। তাঁদের উদ্দেশ্য করে নজরুল বলেন, "কবি ও সাহিত্যিক, সুরশিল্পী মানুষের আনন্দলোকের, সৌন্দর্য্য লোকের বাণী বয়ে আনে। এজন্য সাহিত্যিক, কবি, শিল্পীরা মানব-সভ্যতার গৌরব"।[১৮]

কবি তার সাহিত্য সাধনার উৎস সম্পর্কে বলেছেন:

"জীবনের অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করতে চেয়েছি। আমার কাব্য, আমার গান, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য হতে জন্ম নিয়েছে। আমি জীবনের ছন্দে গেয়ে চলেছি– এসব তারই প্রকাশ। আমার কাব্য ও গান বড় হয়েছে কি ছোট হয়েছে, তা আমার জানা নেই।" অভিভাষণের শেষেও কবি তাই তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন "তারা যেন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে অগ্রসর হন। সকল বিশ্বকে, সকল সৃষ্টিকে তারা যেন জানতে পারে, বুঝতে শেখে এবং উপলব্ধি করতে পারে।"[১৯]

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ২২ মার্চ কলকাতা ২/১ ইউরোপীয়ান অ্যামাইলাম লেনে 'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম'-এর দ্বারোদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণের অংশ বিশেষ 'শিরাজী'। নজরুল রচনাবলির 'শিরাজী' শীর্ষক এই ক্ষুদ্র অভিভাষণ দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার ৯ চৈত্র ১৩৪৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।[২০]

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ ডিসেম্বর কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে 'কলিকাতা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনে'র দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে 'কাজী নজরুল

---

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮২
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮৩
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮৩
২০. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮৪

ইসলামের ভাষণ' আল্লাহর পথে আত্মসমর্পণ। এই অভিভাষণে আল্লাহর প্রতি নিবেদন চিত্ততার সুন্দর বাঙময় প্রকাশ ঘটেছে।

'মধুরম' ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ মার্চ বনগাঁ সাহিত্য সভার চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। কবি যে সময় এই অভিভাষণ প্রদান করেন, তখন তিনি আধ্যাত্মিক জগতের সন্ধানে উন্মুখ। তাই এ অভিভাষণে তিনি বলেন:

> আমায় সাহিত্য-সম্মেলনে ডেকেছেন সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য শোনার জন্য গূঢ় তত্ত শোনার জন্য নয়। মিষ্টিসিজম বা মিস্ট্রির মাঝে যে মিষ্টি, যে মধু পেয়েছি, তাতে আজ আমার বাণী কেবল "মধুরম মধুরম মধুরম"! এই মধুরমকে প্রকাশের ভাব- ভক্তি- ভাষা এখন আমরা চির-মধুরের ইচ্ছাধীন। আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন, মরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি।[২১]
>
> ১৯৪১ সালের ৫ এবং ৬ এপ্রিল, কলকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত-জয়ন্তী উৎসবের সভাপতি রূপে নজরুল তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন 'যদি আর বাঁশি না বাজে'– এই অভিভাষণে নজরুল 'বিশ্ব ভুবনের পরম প্রভুর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন পরম সুন্দরকে'। তিনি বলছেন "অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়ঘন সুন্দর, প্রেমঘন, প্রেমঘন সুন্দর, রসঘন সুন্দর, আনন্দঘন সুন্দর।"[২২]

এ অভিভাষণের লক্ষ্যণীয় বিষয় এতে কবির বেদনা, হতাশা এবং অভিমানের সুর সুস্পষ্ট। অভিমানের সুরে তিনি বলেছেন–

> "যদি আর বাঁশি না বাজে আমি কবি বলে বলছিনে আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি আমায় ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি, আমি প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।"[২৩]

---

২১. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮৪
২২. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮৪
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-১৮৫

নজরুলের অভিভাষণগুলো পাঠ করতে গিয়ে আমরা একটি সত্য উপলব্ধি করি যে, তাঁর সাহিত্য মানস ও জীবনাদর্শ বুঝতে গেলে কবির এই অভিভাষণগুলো পাঠ অপরিহার্য। সমাজের কাছ থেকে তাঁর যা প্রাপ্য ছিল, তিনি পাননি। এজন্য বেদনার সঙ্গে হলেও অকপটে তিনি বলেছেন যে, তিনি জীবনকে ভালোবাসতে চেয়েছিলেন, মানুষের জীবনের, সমাজের এবং বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে চেয়েছিলেন। যা অসুন্দর সেখানেই সুন্দরের প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর ঐকান্তিক কামনা। এই কল্যাণ প্রচেষ্টায় সমাজের যুবক ও তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর প্রত্যাশা ছিল অনেক। এ কারণেই তিনি প্রতিটি অভিভাষণে তরুণদের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন, যেন তারা সকল অসত্যের বিরুদ্ধে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারে।

শুধু বিষয় গৌরবেই যে এ সকল অভিভাষণ উজ্জ্বল, তা নয়। অভিভাষণগুলোতে শব্দ ব্যবহারে তথা বাণীবিন্যাসেও নজরুল বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তৎসম, তদ্ভব শব্দের পাশাপাশি এসেছে বিদেশি শব্দের সুচারু প্রয়োগ এবং সুষম শব্দ ব্যবহার, বাগ-বৈদগ্ধ, দেশজ বাগধারা ও প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগে কবি এক অনিন্দ্য সুন্দর ভাষা নির্মাণ করেছেন। বলা চলে, অভিভাষণগুলোতে আমরা নজরুলের গদ্য শৈলীরও এক অসাধারণ পরিচয়ে প্রত্যক্ষ করি।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' (সওগাত কার্তিক ১৩২৬) একটি প্রতিক্রিয়াজাত রচনা। নজরুল তাঁর এ প্রবন্ধে তুর্কি রমণীর অপরূপ সৌন্দর্য সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা তুলে ধরেছেন। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধ উদ্বোধন (বকুল, আষাঢ় ১৩২৭) পরে 'জাগরণী' নামে 'যুগবাণী' (অক্টোবর ১৯২২) গ্রন্থে সংকলিত। উদ্বোধন বা জাগরণী অনাদৃতা বকুল ফুল নিয়ে ছোট একটি আবেগপ্রবণ রচনা। প্রবন্ধের শুরুতে পল্লি প্রান্তরের মেঠো গানের সহজ সুরে বকুলের প্রতি জেগে ওঠার আহ্বান, তারপর পল্লি শিশুর মুক্ত বিহার প্রাণ নিয়ে পল্লি তরুণের তাজা খুনের তীব্র কাঁপুনি নিয়ে বকুল ফুলকে জাগতে বলা, কিন্তু বকুলকে জাগরণের আহ্বান রূপান্তরিত হয় শাশ্বত বাঙালির জাগরণের ডাকে।

নবযুগ প্রবন্ধে নজরুল রুশ বিপ্লব, আয়ার্ল্যান্ডের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সামন্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলমুক্ত নতুন তুরস্ক এবং পরাধীন ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রথিত করেছেন। এর থেকে নজরুলের সাহিত্যিক সংবাদিক জীবনের শুরু স্বদেশি ও আন্তর্জাতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংগ্রামের প্রকৃতি একরূপ ছিল না, কিন্তু মানুষের মুক্তি যেখানে মোক্ষ সেখানে নজরুল কোনো বিভেদ দেখেননি। আর তাই সে সংগ্রামের চিত্রকেও তিনি তুলে ধরতে পারেন। ঐ কারণেই কাস্তে হাতুড়ি এবং অর্ধচন্দ্রের প্রতীকের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখতে পাননি তিনি।

রুশিয়া বলিল, "মারো অত্যাচারীকে! ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির! ভাঙো দাসত্বের নিগড়! এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন মুক্ত আকাশের এই মুক্ত মাঠে দাঁড়াইয়া কে কাহার অধীনতা স্বীকার করিবে? এই খোদকারী শক্তিকে দলিত কর। এই স্বার্থের শাসনকে শাসন কর"। "আল্লাহু আকবর" বলিয়া তুর্কী সাড়া দিল। তাহার শূন্য নতশিরে আবার অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত কৃষ্ণশিখ ফেজের রক্ত রাগ স্বাধীনতা প্রহরীর অন্তরে মহাভীতির সঞ্চার করিল। আইলিশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "যুদ্ধ শেষ হয় নাই। এখনো বিশ্বে দানব শক্তির বজ্রমুঠি আমাদের টুটি টিপিয়ে ধরিয়া রহিয়াছে। এ অসুর শক্তি ধ্বংস না হইলে দেবতা বাঁচিবে না। যজ্ঞ জ্বলুক। এ হোম শিখায় যদি কেহ যোগ না দেয়, আমরা আমাদের প্রাণ আহুতি দি"। এমন সময় ভারত জাগিল।[২৪]

বস্তুত পক্ষে বিশের দশকে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবিরোধী অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতে যে রাজনৈতিক জাগরণ ও সচেতনতার মুক্তি সংগ্রামের যে প্রভাব পড়েছিল সে তথ্যও নজরুলের 'নবযুগ' প্রবন্ধ থেকে পাওয়া যায়।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলি ও শওকত আলির নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলনকে নীতিগতভাবে নজরুল সমর্থন করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ফলে স্বরাজ আসবে, আর তুরস্কে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিভূ ইসলামের শেষ খলিফা সুলতানের প্রতি ছিল না তাঁর সমর্থন, ছিল আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তফা

---

২৪. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ১৯৬১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-৩৭২

কামাল আতাতুর্কের প্রতি। কিন্তু স্বদেশে ঐ দুটি আন্দোলনের ব্রিটিশ বিরোধী চরিত্র এবং হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উৎসাহী হয়ে তিনি স্বয়ং তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং লেখনী চালনা করেন, বিশেষত ভারতের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মিলিত আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লিখেছেন :

> "ঐ শোনো তরুণ কণ্ঠের বীর বাণী– আমাদের মধ্যে ধর্ম বিদ্বেষ নাই, জাতি বিদ্বেষ নাই, বর্ণ বিদ্বেষ নাই, আভিজাত্য অভিমান নাই। আজ আমরা আমাদের ঐ মুক্তিকামী নিহত ভাইদের রক্তপূত সবুজ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া তাহাদের পবিত্র স্মৃতির তর্পণ করিতেছি।
>
> এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বৌদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সবগণ্ডী কাটাইয়া সব সংকীর্ণতা, সব মিথ্যা, সব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃত্বের শব। ঐ গোরস্থান, ঐ শ্মশান ভূমিতে শোন, শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই।"[২৫]

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে বিশের দশকের প্রথমার্ধে ভারতে অসহযোগ খেলাফত আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐ মহামিলনের অভূতপূর্ব ঘটনা নজরুলের চিন্তা চেতনা ও মন মানসিকতার ওপর এমন গভীর প্রভাব ফেলে যে তা তাঁর বিশ্বাস ও স্বপ্নে পরিণত হয়। বিশের দশকের শেষার্ধে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের জাগরণে অসহযোগ খেলাফত যুগের হিন্দু মুসলমান ঐক্য সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাঁধে, নজরুলের স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় কিন্তু বিশ্বাস ভঙ্গ হয় না। নজরুল তাঁর জীবনে সুস্থাবস্থার শেষ দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান মিলনের গান গেয়েছেন, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ করেছেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলের মতো অসাম্প্রদায়িক লেখক বিরল। "গেছে দেশ দুঃখ নাই/ আবার তোর মানুষ হ" এই পঙ্‌ক্তিটিকে শিরোনাম রূপে ব্যবহার করে নজরুল সমকালীন মানুষের হতাশা দূর করার জন্য আবেগময় প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন– পরাধীন মানুষ যখন হতাশা থেকে উদ্ভূত অনিশ্চয়তায় দৈবনির্ভর হয়ে পড়েছিল সেই

---

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭৩

মুহূর্তে নজরুলের এই প্রবন্ধ হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। প্রবন্ধের শুরুতে তিনি লিখেছেন–

> "স্বাধীনতা হারাইয়া আমরা যখন আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হইয়া পড়িলাম এবং আকাশ মুখো হইয়া কোন অজানা পাষাণ দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া কেবলই কান্না জুড়িয়া দিলাম তখন কবির কণ্ঠে আশার বাণী দৈববাণীর মতই দিকে দিকে ঘোষিত হইল "গেছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোর মানষ হ"।[২৬]

আত্মশক্তির অভাব ও দৈবনির্ভরতা এ অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য। পরাধীনতা এ দেশের মানুষের মধ্যে ঐ দুটি প্রকৃতিকে আরো গভীর ও স্থায়ী মজ্জাগত করে দিয়েছিল। নজরুল দৈব নির্ভর অসহায় মানুষের সেই প্রকৃতিকে দূর করার জন্য অভয়বাণী উচ্চারণ করেছেন।

বাস্তবিক আজ আমরা অধীন হইয়াছি বলিয়া চিরকালই যে অধীন হইয়া থাকিব এরূপ কোন কথা নাই। কাহাকেও কেউ চিরদিন অধীন করিয়া রাখিতে পারে নাই, কারণ ইহা প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কেহ কখনো জয়ী হইতে পারে না।

এই প্রবন্ধে যেমন নজরুলের আন্তর্জাতিক চেতনার পরিচয় পাওয়া পাওয়া যায় তেমনি দাসত্ব, মনুষ্যহীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ শূন্য কাপুরুষতার প্রতি তাঁর গভীর ঘৃণার পরিচয় ফুটে ওঠে। এ শৃংখলা মনে কে করবে? সে প্রশ্নের উত্তরও তিনি দেন, 'আমরা' কিভাবে তারও পথ নির্দেশ, "ত্যাগ, বিসর্জন, উৎসর্গ বলিদান ছাড়া কি কখনও দেশ উদ্ধার হয়েছে, না হইতে পারে?" নজরুল আলোচ্য প্রবন্ধে এই দুঃখ-কষ্টকে বাইরের ব্যাপার বলেছেন। তিনি সত্য মহান পবিত্র কার্যে আত্মতৃপ্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রবন্ধে নজরুল পরাধীন মানুষকে ভেতরে ও বাইরে জাগাতে চেয়েছেন। তাই তাঁর প্রশ্ন:

> "তুমি কী চাও? - কুকুর বিড়ালের মত ঘৃণ্য মরা মরিতে, না মানুষের মত মরিয়া অমর হইতে? তুমি কী চাও? শৃঙ্খল, না স্বাধীনতা? তুমি কী চাও? উষ্ণীষ মস্তকে উন্নত শীর্ষ হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া পুরুষের মত গৌরব দৃষ্টিতে অসঙ্কোচে তাকাইতে, না নাঙ্গা শিরে প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করিয়া কুব্জ পৃষ্ঠে গোলামের মত অবনত হইয়া হুজুরীর মতলবে শরমে চক্ষু

---

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭৫

নত করিয়া থাকিতে? যদি এই শেষের দিকটাই তোমার লক্ষ্য হয়, তবে তুমি জাহান্নামে যাও।"[২৭]

নজরুল যে পরাধীনতা বা গোলামিকে কী গভীর ঘৃণা করতেন, তা উপর্যুক্ত উদ্ধৃতির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। আলোচ্য প্রবন্ধ শুধু পরাধীনতার বিরুদ্ধে জাগরণের জন্যে নয়, আঘাতে অপমানে মনুষ্যত্বের জাগরণের আশায় রচিত। তাই উপসংহারে তিনি আবার বলেছেন, "গেছে দেশ দুঃখ নাই / আবার তোরা মানুষ হ!"[২৮]

'ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ' প্রবন্ধে নজরুল জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের নায়ক ডায়ারের নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পরামর্শ দিয়েছেন:

> ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে, তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতের যেকোন প্রান্ত হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া উঠে। এ ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চির সজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ - কসাই এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা"।[২৯]

এ প্রবন্ধে নজরুলের বক্তব্য পরিহাস ছলে প্রকাশিত হলেও তার মধ্যে একটা রূঢ় সত্য লুকায়িত রয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মানুষের জাতির, দেশের চরম অবনতির সময় ডায়ারের মতো নরপিশাচ জালিমের আবির্ভাব অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। মানুষ যখন তার অধিকারের কথা বিস্মৃত হয়, জীবনের গতি-চাঞ্চল্য বিসর্জন দেয়, মান-অপমান জ্ঞান ভুলে যায়। ভৃত্য জীবনকে পরম পাওয়া মনে করে তখন তাদের আঘাতের প্রয়োজন যা শত্রুর কাছ থেকেও আসতে পারে ।

ডায়ারের প্রতি নজরুল কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন আরো একটি কারণে। সেই জালিয়ানওয়ালাবাগের হতভাগ্যদের রক্তের উপর দাঁড়াইয়া হিন্দু মুসলমান দুই ভাই গলাগলি করিয়া কাঁদিয়াছে। দুঃখের দিনেই প্রাণের মিলন

---

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭৭
২৮. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭৮
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৭৯

সত্যিকার মিলন হয়। নজরুল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ভারতের দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের মিলনে এক মহামিলনের স্বপ্ন দেখেছেন।

> "এস ভাই হিন্দু! এস ভাই মুসলমান! তোমার আমার উপর অনেক দুঃখ-ক্লেশ অনেক ব্যথা-বেদনার ঝড় বহিয়া গিয়াছে; আমাদের এ বাঞ্ছিত মিলন বড় কষ্টের ভাই! আমাদের প্রীতি-বন্ধন অক্ষয় হোক। আমাদের এ মহামিলন চিরন্তন হোক।"[৩০]

নজরুলের ঐ স্বপ্ন সার্থক হয়নি, সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপে ঐ স্বপ্ন ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেছে, পরিণতিতে ভারতও খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু নজরুলের স্বপ্ন যে মহৎ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কাজী নজরুল ইসলাম কৃষক শ্রমিক শ্রেণির সমস্যা ও আন্দোলনের সমর্থনেও লিখেছেন। বাংলার কৃষকের দুরবস্থা সম্পর্কে 'ধর্মঘট' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন:

> "চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনৎ করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দুবেলা পেট ভরিয়া মাড় ভাত খাইতে পায় না; হাঁটুর ওপর পর্যন্ত একটা তেনা বা নেঙটা ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা জীবনেও ঘটিয়া উঠে না, ছেলে মেয়েদের সাধ-আল্লাদ মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনেরা পায়ের উপর পা দিয়া বারমাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন কাটাইয়া দেন!"[৩১]

এ থেকে বোঝা যায়, নজরুল শুধু বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধেই নয়, স্বদেশি শোষণের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। শ্রমিকদের, বিশেষত কয়লাখনির মজুরদের অমানবিক জীবন সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। তিনি রানীগঞ্জ কয়লাখনি শ্রমিকদের অবস্থা তুলে ধরেছেন এভাবে–

> "কয়লার খনির কুলিদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহাদের কেহ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের বেশী বাঁচে না; তাঁহারা দিবারাত্রি খনির নীচে পাতাল পুরীতে আলো-বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানী তো

---

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮১
৩১. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮২

তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ হতভাগাদের স্বাস্থ্য, আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়া চাইবেন না। এই কুলিদিগের চেহারার দিকে তাকাইয়া কেহ কখনো চিনিতে পারিবেন না যে, ইহারা মানুষ কি প্রেত-লোক ফেরত বীভৎস নরকঙ্কাল! দেশের সমস্ত কারখানায়, আড়তে গুদামে 'ভাবিয়া চিন্তিয়া মানুষ হত্যার' এই রূপ শত শত বীভৎস নগ্নতা দেখিতে পাইবেন।"৩২

নজরুল কয়লাখনি শ্রমিকদের বাস্তব চিত্র অঙ্কন করে তাদের ধর্মঘটের সমর্থনে বুরোক্র্যাসি বা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লিখেছেন, তিনি শ্রমজীবীদের সংগ্রাম ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে এক সূত্রে গ্রথিত দেখতে চেয়েছেন। আমলাতন্ত্রের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে অভিন্নরূপে প্রত্যক্ষ করার সংকল্প নজরুলের আগে বাংলা সাহিত্যে অপর কোনো লেখকের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই।

'লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য' স্মৃতিচারণে প্রধান্য পেয়েছে একজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতার প্রয়াণে শোকাতুর মানুষের মিলনের দৃশ্য। শোকাতুর হিন্দু-মুসলমান, মাড়োয়ারি, বাঙালি, হিন্দুস্থানিরা যে তাদের ভেদাভেদ ও জাত বিচার ভুলে এক হয়ে গিয়েছিল সেটাই নজরুলকে অনুপ্রাণিত করেছে সর্বাধিক।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা নজরুলের বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল।লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে শোকাতুর জনতার মধ্যে সেই প্রত্যক্ষ করে নজরুল ঐ সাময়িক মিলনকে চিরন্তন দেখতে চেয়েছিলেন।

বিশের দশকে খেলাফত আন্দোলনের ফলে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তার একটি ছিল বহু ভারতীয় মুসলমানের কাছে আর ভারতবর্ষ বাসযোগ্য বলে বিবেচিত থাকেনি ফলে হিজরত বা দেশ ত্যাগ শুরু হয়। ইতপূর্বে ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে তৃতীয় ব্রিটিশ-আফগান যুদ্ধের মাধ্যমে আফগানিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে। আফগান বাদশাহ্ আমানুল্লাহ ভারতীয় মুসলমানদের হিজরতে উৎসাহ দেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মে মাস থেকে ভারতীয় মুসলমানদের দেশত্যাগ শুরু হয় এবং সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও

---

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮২

ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে প্রায় আঠারো হাজার মুসলমান ঐ সময় দেশত্যাগ করে আফগানিস্তানের পথে চলে যান। ভারতীয় মুহাজিরদের প্রথম দলটি মে মাসে কাবুল পৌঁছান, তাঁদের একাংশের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তানে বসবাস করা, কিন্তু বেশির ভাগ মুহাজিরের লক্ষ্য ছিল আনাতোলিয়ায় গিয়ে তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করা। নজরুল সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ভারত ত্যাগ করার সময় ঐ মুহাজিরিনরা কীভাবে নির্যাতিত হয়েছিল তা লিখেছিলেন "মুহাজিরীন হত্যার জন্য দায়ী কে"? প্রবন্ধে।

একই ভাবে 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত এবং 'যুগবাণী' গ্রন্থে সংকলিত 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধে নজরুলের সাহিত্য চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। 'সাহিত্যিক' প্রবন্ধের শুরুতেই নজরুল বাঙালি মুসলমান সমাজ বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে স্বীকার করে নেওয়া আনন্দ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে আধুনিক কালের শুরুতে বাঙালি মুসলমান সমাজে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা? সেই হাস্যকর বির্তকের কথা মনে পড়ে, বাঙালি মুসলমান যে বিলম্বে হলেও মাতৃভাষা পড়া শেখা ও লেখার চেষ্টা করছে তাতে নজরুল যারপর নাই প্রীত হন। বিশেষত বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভের জন্যে তরুণ বাঙালি মুসলমান লেখকদের সাধনা নজরুলকে আশাবাদী করে তোলে। নজরুল এ প্রবন্ধে বলেছেন যে, "এখন আমাদের বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে সর্ব প্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝর্ণার মত ঢেউ ভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে। যে সাহিত্য জড়, প্রাণ নাই, সে নির্জীব সাহিত্য দিয়া আমাদের কোন উপকার হইবে না, আর তাহা স্থায়ী সাহিত্যও হইতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া খুব কম লেখকেরই লেখায় মুক্তির জন্য উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা ফুটিতে দেখা যায়"।[৩৩] নজরুল সাহিত্যে প্রাণের অভাবের কারণ নির্দেশ করে লিখেছেন, সাহিত্য প্রাণের অভিব্যক্তি, যার নিজের প্রাণ নেই, যে নিজে জড় সে লেখায় প্রাণ সঞ্চার করবে কিভাবে? লেখকের মধ্যে প্রাণের অভাবের কারণও নজরুল নির্দেশ করেছেন, তাঁর মতে, আমাদের জীবন ভয়ানক একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন, সৌন্দর্যহীন এবং জন্ম থেকেই দার্শনিক গম্ভীর প্রকৃতির।[৩৪] নজরুলের এই বক্তব্যে যেন প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য চিন্তা অনুরণিত।

---

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮৮

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৮৮

সাম্প্রদায়িকতা শুধু ধর্মীয় বা সামাজিক নয় অর্থনৈতিকও বটে, নজরুলের 'উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন' প্রবন্ধে সে উপলব্ধির প্রকাশ। এ প্রবন্ধের ওপরে রবীন্দ্রনাথের দুটি বিখ্যাত পঙক্তি উদ্ধৃত, "হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান অপমানে হবে তাদের সবার সমান"।[৩৫] নজরুল দেশের মহাজাগরণের দিনে দেশের তথাকথিত "ছোট লোক সম্প্রদায়"-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, অভিজাত গর্বিত সম্প্রদায় ঐ হতভাগ্যদের অনুরূপ নামকরণ করেছে। কিন্তু নজরুলের মতে ঐ তথাকথিত "ছোট লোক"-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ আর ঐ অভিজাত গর্বিত "ভদ্রলোকের" অন্তরসীমায় অন্ধকার। ভদ্রলোক ও ছোট লোক অর্থাৎ সমাজের উঁচু ও নিচু শ্রেণির মানুষ। পূর্বোক্ত প্রবন্ধে তিনি জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেছিলেন আর আলোচ্য প্রবন্ধে অর্থনৈতিক শ্রেণি বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার।

নজরুলের 'মুখবন্ধ' প্রবন্ধটি আমলাতন্ত্রকে ব্যঙ্গ করে লেখা আর রোজ কেয়ামত বা প্রলয় দিন একজন বহুদর্শী বিজ্ঞ-বৈজ্ঞানিকের পৃথিবী ধ্বংসের দিন সম্পর্কে বক্তব্যের জবাবে লিখিত একটি তথ্যবহুল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। বাঙালির ব্যবসাধারী প্রবন্ধটিও ব্যঙ্গাত্মক। বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ব্যবসা বাণিজ্যে ঝোঁক দেখে তিনি লিখেছেন, বাণিজ্যে বসতে মিথ্যা কথাটা তেমনি রাতের মতন অন্ধকার।[৩৬]

আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন? প্রবন্ধে নজরুল বাঙালির মনুষ্যহীনতা, ভণ্ডামি, অসত্য, ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে, বাঙালি অধীন ও চাকুরিজীবী এবং ঐ পেশাই বাঙালির দুর্বলতার কারণ। চাকুরির পেশাকে তিনি দাসত্ব বলেছেন, যে জাতির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প যত বেশি, সে জাতির মধ্যেই স্বাধীন-চিত্তলোকের সংখ্যা বেশি, আর যে জাতির জনসঙ্ঘের অধিকাংশের চিত্ত স্বাধীন, সে জাতি বড় না হয়ে পারে না। ব্যষ্টি লইয়াই সমষ্টি।[৩৭]

প্রাবন্ধিক নজরুল মূলত রাজনীতিক নজরুল, কিন্তু অন্য বিষয়ে কম প্রবন্ধ লিখলেও তার মাধ্যমে তিনি সাহিত্যিক এবং সংগীতজ্ঞ নজরুল বটে।

---

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৯৫
৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ.-৩৯৬
৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ.-৪০

সংবাদপত্রের ভাষা সাধু হবার কারণে সাংবাদিক নজরুলকে প্রথমে সাধু ভাষাতেই লিখতে হয়েছে, পরে অবশ্য নিজের কাগজে তিনি চলতি ভাষাতেই লিখেছেন। কি সাধু কি চলতি উভয় রীতিতেই তিনি সমসাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহ সহজ সরল ভাষায় স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য ও সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি আবার বিষয়ানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করেছেন। নজরুলের গদ্য অলংকৃত নয়, কি সাধু কি চলতি উভয় রীতিতেই তা সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত এবং প্রয়োজনে সরস। নজরুল মৌলিক কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, হয়তো সে কারণেই তাঁর প্রথম দিককার গদ্য রচনাসমূহ আবেগপ্রবণ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সাংবাদিক প্রাবন্ধিক নজরুলের গদ্য অকারণ আবেগ ও উচ্ছ্বাস থেকে মুক্ত হয়ে বিষয়ানুগ হয়ে উঠেছিল।

নজরুলের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রবন্ধ "বাঙালির বাঙলা" প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকায় ৩রা বৈশাখ ১৩৪৯। অসুস্থতার পূর্বে রচিত এই প্রবন্ধে নজরুল লিখেছিলেন: "বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে "বাঙালির বাংলা" সে দিন তারা অসাধ্য সাধন করবে। বাঙালিকে, বাঙালির ছেলে মেয়েকে ছেলেবেলা থেকে শুধু এই এক মন্ত্র শেখাও:

এই পবিত্র বাঙলাদেশ
বাঙালির - আমাদের
দিয়া 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'
তাড়াব আমরা করিনা ভয়
যত পরদেশী দস্যু ডাকাত
'রামাদের' 'গামাদের'।

বাঙলা বাঙালির হোক! বাঙালার জয় হোক! বাঙালির জয় হোক।[৩৮]

নজরুল বাঙালির প্রতি যে আহ্বান জানয়েছিলেন বাঙালিকে যে মন্ত্র শিখিয়েছিলেন ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযদ্ধে বাঙালি তার যথাথর্তা প্রমাণ করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

---

৩৮. সাহিত্যকণিকা, ২০১১, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা। পৃ.-০৭

তথ্যনির্দেশ

১। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত নানা প্রসঙ্গে নজরুল, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, জুলাই ২০০২, জানুয়ারি ২০১৪।
২। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড) রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ১৯৬১ বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩। সাহিত্যকণিকা, ২০১১, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ নজরুলের চিঠিপত্রে প্রতিফলিত নজরুল-ভাবনা

মানব মনের ভাব সংবাদ অপরের কাছে লিখিত ভাবে জানানোই চিঠি। হৃদয়ের এমন কিছু কথা থাকে যা শুধু চিঠিতেই সম্ভব। চিঠিতেই মানুষ নিজেকে উজাড় করে উপস্থাপন করে, তাই চিঠি কথাটি শুনলেই আমাদের মন হঠাৎ কেমন চনমন করে ওঠে। প্রিয়জনের প্রিয় বাক্যটি যেন মধুর হয়েই ধরা দেয় চিঠিতে। আবার কখনো তা অভিমান, অনুযোগের সুরে অনুরণিত, তাই চিঠিতেই একজন মানুষকে জানার সুযোগ ঘটে একান্তভাবে। চিঠি শুধু ভাবেরই মাধ্যম নয়– চিঠি সাহিত্যেরও অংশ। চিঠির মধ্যে লেখককে যেভাবে আবিষ্কার করা যায় অন্য কোনোভাবে তা সম্ভব নয়।

কাজী নজরুল ইসলামের চিঠিপত্র প্রথম সংকলিত হয় আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' গ্রন্থে। পরে তিনি নজরুল রচনাবলিতেও চিঠিপত্র সংকলন করেন। কর্মব্যস্ত নজরুল ইসলাম প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে চিঠি অবশ্যই লিখেছেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ পর্যন্ত সংগৃহীত তাঁর পত্রাবলির সংখ্যা খুবই কম। পত্র প্রবন্ধ নয়, কিন্তু পত্রও একটি সাহিত্য শিল্প। নজরুল ইসলাম তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথমে "বাঁধন হারা" নামে যে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখেন সেটাও ছিল মূলত একটি পত্র সংকলন।[১] এটা ছিল লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের যেমন চিত্র তেমনি তদানীন্তন সমাজ, বিশেষ করে মুসলিম সমাজের নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের কিছু সমস্যা সংকটের চিত্রালেখ্য ও সে সম্বন্ধে লেখকের সমালোচনাধর্মী বক্তব্য। এতে আত্মসমালোচনাও ছিল এবং ছিল আত্মচিন্তার ব্যাখ্যা। প্রকৃত পক্ষে এই লেখা লিখতে গিয়ে নজরুল চিঠি লেখায় হাত পাকিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁর চিঠিগুলো না পড়লে ভেবে পারা যায় না যে চিঠি লেখাও একটা উঁচুমানের শিল্প।

কিন্তু বাঁধনহারা পরিকল্পিতভাবে লিখিত পত্র হলেও এ সংকলনে প্রকাশিত তাঁর পত্রসমূহ তেমন ছাপানোর জন্য পরিকল্পনা করে লেখা হয়তো নয়, ... মাত্র ইবরাহীম খাঁর কাছে লেখা পত্রটি ছাড়া। কিন্তু সেই চিঠি সম্বন্ধে নজরুল প্রথমে বলছেন–

---

১. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, ২০০৬ রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ.-২৬১-৩৬৫

"দেখুন চিঠি না লিখতে লিখতে চিঠি লেখার কায়দাটি গেছি ভুলে" এবং শেষে বলেছেন– "আপনার এত সুন্দর, এমন সুলিখিত চিঠির কি বিশ্রী করেই না উত্তর দিলাম।"[২] এবং চিঠিটা যে খুব গুছিয়ে লেখা হয়নি সে উক্তিও তিনি করেছেন এই বাক্যে– "ব্যথা যদি দিয়ে থাকি আমার গুছিয়ে বলতে না পারার দরুন, তাহলে আমি ক্ষমা না চাইলেও আপনি ক্ষমা করবেন– এ বিশ্বাস আমার আছে।"[৩]

আসল মজাটা এইখানে– এইখানেই আছে নজরুল স্বভাব ও মেজাজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও ভঙ্গী–এর মধ্যে মিশ্রিত ... ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান ঈর্ষা– প্রেম বেদনা, দেশ সমাজ ও মানুষ-প্রীতির– শিল্প, সাহিত্য রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি লেখকের দায়িত্ব ও চিন্তা ভাবনার বহিঃপ্রকাশ এবং সে প্রকাশ কোনো অন্তরাল সৃষ্টি করে নয়– সকল কুণ্ঠাকে বিসর্জন করে। সেই জন্যে এখানে ব্যক্তির হৃদয়ের তাপ প্রবন্ধের নৈর্ব্যক্তিক শীতলতা ছাড়িয়ে পত্রের আলাপচারিতার উষ্ণতায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রবন্ধের সঙ্গে পত্রের যে কী পার্থক্য সে জন্যই সেটা এখানে টের পেয়ে যাই।

আমরা জানি নজরুল ইসলাম কোনো ডায়েরি বা দিনপঞ্জিকা লেখেননি। কিন্তু তাঁর কিছু কিছু চিঠি এই ডায়েরি বা দিনপঞ্জিকার কাজ করেছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার কথা কাউকে জানতে দিতে চাইতেন না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনার কথা তাঁর কবিতা ও কাব্যগীতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। শামসুন্নাহার এক চিঠিতে নজরুলের জীবনের কথা জানতে চেয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে নজরুল লিখেছিলেন–

"আমার জীবনের ছোট-খাট কথা জানতে চেয়েছো। বড় মুশকিল কথা ভাই। আমার জীবনের যে বেদনা, যে রং তা আমার লেখায় পাবে। অবশ্য লেখার ঘটনাগুলো আমার জীবনের নয়, লেখার রহস্যটুকু আমার ওর বেদনাটুকু আমার একন্তই তো আমার সত্যিকার জীবনী রয়ে গেলো।"[৪]

---

২. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী (১৫ নম্বর চিঠি), শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত, মে ১৯৯৫, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা। পৃ.-১১ ও ২১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ.-২১

৪. প্রাগুক্ত, (২০ নম্বর চিঠি), পৃ.-৩০

নজরুলের এই রূপক প্রতীকে আত্মগোপন করে থাকার অভিপ্রায় শেষ পর্যন্ত টেকেনি। হয়তো বিকাশ হবে না, ধার না করে একদিন তিনি যে সব চিঠি লিখেছিলেন ভক্ত ও বন্ধুদের, কবি ভক্তির সতর্ক সিন্দুকে তারা সংরক্ষিত থেকে সে গোপন সংবাদকে যা দিনপঞ্জিকাতে লিখিত হতে পারত– তা পাঠকের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। ফজিলাতুন্নেসার সঙ্গে বিবাহিত নজরুলের গোপন প্রেমের কথার যে চিঠি নজরুল কাজী মোতাহার হোসেনকে লিখেছিলেন, সে গোপনতা ফাঁস হয়ে গেছে। সেখানে নজরুলের মোতিহার কাজী 'মোতাহার' হোসেনকে লেখা ব্যাকুল প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস মিশ্রিত প্রতিটি চিঠি নজরুলের সেই অভিপ্রায়কে ফুটিয়ে তুলেছে। নজরুল তাঁর এক রক্তাক্ত সংগীতে বলেছিলেন-

কাঁটা নিকুঞ্জে কবি
এঁকে যা সুখের ছবি
নিজে তুই গোপন রবি
তোরই আঁখির সলিলে।[৫]

প্রকৃতি তাঁর সেই ইচ্ছাকে সফল হতে দেয়নি। কিন্তু সত্য বলতে কি নজরুলের রক্তে লেখা গানের মতো সুন্দর ঐ চিঠিগুলো তাঁর ভক্তরা প্রকাশ করে এই উপকার করেছেন যে নজরুলের অনেক গানের রহস্য মুক্তির একটা উপায় হয়েছে। এই ধরনের নজরুলের লেখা আরও চিঠি হয়তোবা এখনও কোনো ব্যক্তি বিশেষের গোপন সিন্দুকে লুকিয়ে থাকতে পারে। কলকাতার "আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড" থেকে বৈশাখ ১৪০০-এ প্রকাশিত প্রতিভা বসুর আত্মজীবনী "জীবনের জলছবি"তে প্রতিভা বসু লিখেছেন– "কলকাতা থেকে চলে আসবার পরে নজরুল আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন"।[৬]

যা থেকে নজরুলের এই চিঠিপত্র তাঁর জীবনী রচনা ও তাঁর কাব্য ও সাহিত্য ব্যাখ্যার জন্যে যে অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয় বিষয় তাতে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়।

নজরুলের চিঠিপত্রে আমরা আর এক নজরুলকে খুঁজে পাব অথবা না জানা নজরুলকে দেখতে পাব– এই আশা নিয়েই আমরা নজরুলের চিঠিপত্র বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছি।

---

৫. প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ.০২
৬. প্রতিভা বসু, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। পৃ.-৮৮

চিঠিপত্রও অনেক সময় সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে থাকে এবং সে কারণেই 'পত্রসাহিত্য' বলে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। নজরুল রচিত পত্র সাহিত্যের সংখ্যা কম। তাঁর অধিকাংশ পত্রই ব্যক্তিগত পত্র। নজরুলের কথা সাহিত্যে পরোক্ষভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একমাত্র চিঠিপত্রেই নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এর পাশাপাশি নজরুল রচিত পত্র-সাহিত্যে নজরুলের জবানিতে তাঁর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যদর্শ সম্পর্কেও আমরা কিছু তথ্য জানতে পারি।

নজরুলের লেখা প্রথম যে পত্রটি (তারিখ: ১৯-৮-১৯১৯) সংগৃহীত হয়েছে তা 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' সম্পাদক 'মৌলভী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এম.এ. বি.এল.' কে লেখা। পত্রের শুরু– 'আদাব হাজার হাজার জানবেন। বাদ আরজ' এবং তার শেষে স্বাক্ষর 'খাদেম নজরুল'।[৭] এ যেন একজন উর্দিপরা সৈনিকের কেতাদুরস্ত চিঠি।

চিঠিটি নজরুল করাচি ক্যান্টনমেন্ট থেকে লিখেছিলেন। তখন তাঁর সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতাও বৎসরাধিকাল অতিক্রম করে গেছে। এ সময়েই তিনি কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। চিঠিতেই তিনি উল্লেখ করেছেন। "সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন" এবং নিরবচ্ছিন্ন সময়ের বিশেষ অভাব।[৮]

নজরুলের পত্রে একজন উদীয়মান লেখকের আত্মপ্রকাশকালের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে। কোনো সাময়িক পত্রের সম্পাদকের কাছে লেখা পাঠানোর পর উৎকণ্ঠা এবং মুদ্রিত পত্রিকা বহনকারী ডাক-পিয়নের জন্য প্রতিক্ষার অভিজ্ঞতা কম বেশি অন্য আরও অনেক সাহিত্যিকের মতো নজরুলের জীবনেও ঘটেছে। শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত নজরুলের চিঠিতে নজরুল লিখেছেন "কেবল 'সঞ্চিতার' প্রুফ পেলাম– সর্বহারার শেষ প্রুফ কই? 'সর্বহারা' কখন বেরুবে? যেদিন বেরুবে অন্তত ৫০ কপি আমার পাঠিয়ে দেবে"।[৯]

অর্থকষ্ট যে নজরুলের জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল এর প্রমাণও আমরা পাই তাঁর লিখিত চিঠি পত্রে। অন্তত প্রথমজীবনে ১৯২৭ এর প্রথমদিক পর্যন্ত কবি খুবই অর্থকষ্টে ছিলেন। নজরুলের লেখা ষোলটি চিঠিতে টাকার প্রসঙ্গ আছে। এর মধ্যে ১৯২৭-এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত সাতাশটি চিঠির

---

৭. কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল পত্রাবলী (২ নম্বর চিঠি), প্রাগুক্ত, পৃ.০২

৮. প্রাগুক্ত, পত্রম্বর-২, পৃ.০২

৯. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-২৩, পৃ.-৩৫

মধ্যে চৌদ্দোটিতেই দেখা যায় তিনি টাকা চাইছেন অথবা আর্থিক দুরবস্থার কথা লিখছেন অর্থপ্রাপ্তির আশায়। এই চিঠিগুলোর অধিকাংশই তাঁর গ্রন্থের প্রকাশকের কাছে লেখা, দু'একটি বন্ধুদের উদ্দেশে। একটি-দুটো চিঠি এতোই কাকুতি মিনতি করে লেখা, যা পড়লে আজও অনুমান করা সম্ভব, কবির আর্থিক সংগতি কতটা নিচে নেমে গিয়েছিল। আর এ থেকে মনে পড়বে দৃঢ়চেতা কবি এরই মধ্যে তাঁর সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর্থিক দুরবস্থায় পতিত নজরুলের লেখা চিঠির ভাষা এ রকম;

১. শ্রীব্রজবিহারী বর্মণকে লিখিত ৯ই অক্টেবর ১৯২৬– টাকার বড্ড দরকার। যেমন ক'রে পার পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার ক'রে পাঠাও। তুমিত সব অবস্থা জান। বলেও এসেছি তোমায়।[১০]

২. বন্ধু ও প্রকাশক আফজাল উল হককে ২৮ শে মার্চ ১৯২২ হ্যাঁ– আমায় আজই কুড়িটি টাকা টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে পাঠাবেন, বড্ড বিপদে পড়েছি। আর কারুর কাছে আমি যাই-ই-হই, আপনার কাছে আমি হয়ত ভালতে মন্দতে মিলে তেমনি আছি। এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে আপনারই স্মরণ নিলুম। আশা করি বঞ্চিত হব না, তা আপনি যত দুর্দশাগ্রস্ত হোন না কেন। টাকা চাই-ই-চাই, ভাই। নইলে যেতে পারব না। অনেক কষ্ট দিলুম– আরও দেব। ব্যথার দান মোট নয়খানা পেয়েছি মাত্র; আরও খান পনেরো আমার দরকার। যাক টাকা পাঠাবেনই যা করে হোক।[১১] অর্থের জন্য নজরুলের এই আকুতি প্রকাশ করে লেখা চিঠিগুলো ব্যক্তি জীবনে তাঁর কষ্ট, সংগ্রামকেই মনে করিয়ে দেয়। এই অর্থকষ্ট নজরুলের গ্রামোফোন কোম্পানিতে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত আর ঘোচেনি। নজরুলের জীবনে কখনো কখনো সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য এলেও তাঁর সারাজীবনই কেটেছে আর্থিক টানা পোড়নে। জীবনের প্রায় শুরুতে লেখা এ চিঠিতেও আমরা দেখি নজরুল বলেছেন টাকা ফুরিয়ে গেছে এবং সেই সঙ্গে আফজাল-উল হক অথবা আলী আকবর খানের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে পাঠানোর অনুরোধ।

নজরুলের পত্রে একজন উদীয়মান লেখকের আত্মপ্রকাশ কালের আশা আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়েছে। নজরুলের চিঠিপত্রে যেমন পাওয়া যায় কৌতুকপ্রিয়তা তেমনি অলংকরণ প্রবণতা। এছাড়া করাচির আন্তর্জাতিক

---

১০. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-২৩. পৃ.-৩৮

১১. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-৯ পৃ.-৭

পরিবেশেরও পরিচয় পাওয়া যায় নজরুলের চিঠিতে ব্যবহৃত কিছু ইংরেজি শব্দ প্রয়োগে। নজরুলের মধ্যে যে ভবিষ্যতের একজন সাহিত্যিক নজরুল ঘুমিয়ে আছেন সেই আত্মপ্রত্যয়, তাঁর এ চিঠিতে সুস্পষ্ট। তিনি লিখেছেন "আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি কথা"।[১২]

মাসিক কালিকলম পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক বন্ধু মুরলীধর বসুকে ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯২৬-এ লিখেছিলেন,

"আমি শুয়ে শুয়ে কয়েকটা গান লিখেছি উর্দু গজলের সুরে। তার কয়েকটা "সওগাতে" দিয়েছি। দুটো তোমার কাছে পাঠাচ্ছি– বঙ্গবাণীতে দিয়ে আমায় তাড়াতাড়ি কিছু নিয়ে দেবার জন্য। অন্যসব জায়গায় দশ টাকা করে দেয় আমার প্রত্যেকটা কবিতার জন্য, একথা ওদের বলো। গান দুটো পেয়েই যদি ওরা টাকাটা দেয় তা'হলে আমার খুব উপকারে লাগে। –আমাদের আর মান-ইজ্জত রইল না, মুরলীদা– না, অর্থাভাব বুঝি মনুষ্যত্বটাকেও কেড়ে নেয় শেষে!...

হ্যাঁ, 'বঙ্গবাণী'তে জিজ্ঞাসা করো, ওঁরা যদি স্বরলিপি চান তাহলে গজল দুটোর স্বরলিপি করে পাঠাতে পারি ২/১ দিনের মধ্যেই। 'বঙ্গবাণী'র সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দাও না মুরলীদা,– ওঁরা প্রতি মাসে কিছু দেবেন, আমিও সেই অনুসারে লেখা দেবো প্রতি মাসে। কি হয় লিখে জানিও।'[১৩]

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে; ১৯ শে ডিসেম্বর ১৯২০-এ লেখেন–

"যদি হাতে টাকা থাকে, তবে 'বিজলী'র দু'টাকা তাদের অফিসে দিয়ে আমার ঠিকানায় কাগজ পাঠাতে বলিস। তোর বৌ এর খবর কি? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফতে আলাপ করিয়ে দিস। কালই চিঠি না পেলে কিন্তু তোদের মাঝে জোর কলহ বাঁধিয়ে দেব। কান্তি বাবুকে আমার প্রীতি ভালবাসা আর প্রণাম জানাস। তোর গল্প লিখব, একটু গুছিয়ে নিই আগে। বঙ্গে শীত এশার

---

১২. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-২. পৃ.-০২

১৩. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-২৭ পৃ.-৪০

জায়গায়। টাকা ফুরিয়ে গেছে। আফজল কিংবা খাঁ যেন শিগ্‌গির টাকা পাঠায়। খোঁজ নিবি, আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে তা ব্যর্থ হবে না– আমি তা সুদে আসলে পুষিয়ে দেব।

ইতি–

তোর পীড়িত দধি-লুব্ধ মার্জার, নজর"[১৪]

নজরুল ইসলাম করাচি সেনানিবাস থেকে হাফিজের একটি কবিতার ভাবানুবাদ 'আশায়' শিরোনামে সবুজপত্রে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন। 'সবুজপত্র' সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী কবিতাটি প্রকাশের জন্য অনুমোদন না করায় উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তা 'প্রবাসী' পত্রিকার তৎকালীন সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রকাশের জন্য দেন। লেখকের অনুমতি না নিয়েই অন্য পত্রিকায় কবিতাটি ছাপানোর জন্য দেন তিনি। পরে সৌজন্য রক্ষার্থে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নজরুলকে একটি পত্র দেন। আলোচ্য পত্রটি সে পত্রেরই উত্তরে লেখা। এ পত্রে একজন সাহিত্য সমালোচকের ন্যায় কবি নিজেই তাঁর কবিতার রসোপলব্ধির পরিচয়ে দিয়েছেন সুললিত ভাষায় একটু দীর্ঘ হলেও পত্রের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি:

"আমি কবিতাটি লিখেছি, পারসিক কবি হাফিজের মধ্যে বাঙ্গলার সবুজ দূর্বা ও জুঁই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চুর্ণ কুন্তলের যে মৃদু গন্ধের সন্ধান আমি পেয়েছি, সে-সবই ত খাঁটি বাঙ্গলার কথা, বাঙ্গালি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আনন্দ রসের পরিপূর্ণ সমারোহ। কতশত বছর আগের পারস্যের কবি, আর কোথায় আজকের সদ্য শিশির ভেজা সবুজ বাঙ্গলা! ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যুসমারোহের মধ্যে রসের এই যে চিরন্তন প্রেমিক মনের সমভাব আমি চাক্ষুষ করলাম, আমার আপনজন বাঙ্গালিকে সেইকথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই এক টুকরো কবিতা হয়ে ফুটে বেরিয়েছে। জানি না জুঁই ফুলের মৃদুগন্ধ ও দুর্বার শ্যামলতা এর মধ্যে ফুটেছে কিনা। তবু বাঙ্গালির সচেতন মনে মানুষের ভাবজীবনের এই একাত্মবোধ যদি জাগাতে পারে তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।"[১৫]

---

১৪. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-৬. পৃ.-৪

১৫. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-৩ পৃ.-৩

করাচি সেনানিবাস থেকে স্বদেশে ফিরে এসে কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতার যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলন, তন্মধ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় অন্যতম। কিছুদিনের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তা পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা দ্বিতীয় পত্রে সুস্পষ্ট। দেওঘর থেকে লেখা ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২০ তারিখে পত্রের শিরোনাম এবং পত্র শেষে নিজ নাম লেখার অন্তরালে কবির কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্যণীয়। সম্বোধনটি হচ্ছে ভো ভো লিভঁ মশিয়েঁ এবং চিঠির শেষে লেখা "তোর পীড়িত দধি-লুব্ধ মার্জার নজর"। কাজী নজরুল ইসলামের এই সংক্ষিপ্ততম নাম 'নজর' তাঁর আর কোনো পত্রে আমরা লক্ষ্য করিনি, সর্বনামও আপনি থেকে তুই-এ রূপান্তরিত। এ পত্রে আরেকটি বিশিষ্টতা হচ্ছে পারিবারিক কুশলবার্তা-বিনিময়। নজরুল এখানে লিখেছেন "তোর বৌ এর খবর কী? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফতে আলাপ করিয়ে দিস"।[১৬]

১৯২৪ সালে এক স্কুলের মিলাদ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে তিনি আমন্ত্রিত হন এবং কুড়িগ্রাম যান। এই সূত্রেই কবির সঙ্গে মাহফুজুর রহমানের পরিচয় ঘটে। মাহফুজুর রহমান তখন কারমাইকেল কলেজের ছাত্র। তখন তাঁর কাছে লেখা নজরুলের দুটি পত্রের মধ্যে আমরা দুটি তথ্য জানতে পারি। একটি হচ্ছে বিভিন্ন সাহিত্যিক সাংবাদিক এবং বিদ্বজ্জনের সঙ্গে যেমন প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তেমনি স্কুল কলেজের ছাত্র ও তরুণ যুবকদের সঙ্গেও নজরুলের প্রীতির সম্পর্ক কম ছিল না। তাই এ পত্রে তিনি কয়েকজন তরুণ ছাত্রের কুশলাদি জানতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় তথ্যটি হলো ১৯২৫ সালে নজরুলের "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙার গান" বাজেয়াপ্ত হয়। কিন্তু এ দুটি গ্রন্থের সমস্ত কপি সরকার জব্দ করতে পারেনি। কবি দেশের বিভিন্ন প্রান্তের এই তরুণ ছাত্রদের মাধ্যমে সে বইগুলো গোপনে বিক্রির ব্যবস্থা করেছিলেন। আলোচ্য দুটি পত্রে বইয়ের নাম উল্লেখ না করেই লিখেছেন "বইয়ের টাকা আদায় করে থাকলে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিবে অথবা কতগুলি বই ছিল ওদের কাছে তার কি হলো?"[১৭] মাহফুজুর রহমান যখন করটিয়া কলেজের ছাত্র তখন ইব্রাহীম খাঁ ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ তৎকালীন বাংলার

---

১৬. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-৫. পৃ.-৪

১৭. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-৭ ও ৮, পৃ.-১০ ও ১১

মুসলমান সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও বেদনার কথা উল্লেখ করে ১৯২৫ সালে একটি সুদীর্ঘ পত্র নজরুলকে প্রেরণ করেন। নজরুল সে পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে পারেননি। নজরুলের সঙ্গে মাহফুজুর রহমানের পরিচয়ের কথা শুনে ইব্রাহীম খাঁ সে পত্রের বিষয়ে নজরুলকে একটি চিঠি লেখার ব্যাপারে মাহফুজুর রহমানকে নির্দেশ দেন। অধ্যক্ষের নির্দেশ মতো নজরুলকে যে পত্র প্রেরণ করা হয়, তার উত্তর চারদিন পরেই ১৬ নভেম্বর ১৯২৭ তারিখে মাহফুজুর রহমানের হস্তগত হয়। মাহফুজুর রহমান তাঁর পত্রে নওরোজ পত্রিকা কেন বন্ধ হয়ে গেল সে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলেন। পত্রিকাটি স্বত্বাধিকারী ছিলেন বে-নজির আহম্মদ। পত্রিকাটি কেন বন্ধ হলো সে সম্পর্কে নজরুল তাঁর পত্রে উল্লেখ না করে তিনি জানান যে, 'ওর সম্পর্কে থাকা আমার আর নিরাপদ নয় ভেবেই ওর থেকে সম্বন্ধ ছিন্ন করেছি।' এর কারণ হলো, বে-নজির আহম্দ তখন রাজার রোষে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। নজরুল তখন সংসারী মানুষ, পুত্র সন্তান বুলবুলের পিতা। সুতরাং তিনি ইচ্ছে করেই নিজেকে রাজনীতি থেকে দূর সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাছাড়া অভাবের তাড়নায়ও তিনি ক্ষুব্ধ। ক্ষোভের সঙ্গেই তাই তিনি এ চিঠিতে লিখেছিলেন "এক এক সময় নিবিড় বেদনার সঙ্গে অনুভব করি যে, কত বিরাট সম্ভাবনার আশা আমার অভাবের আওতায় খর্ব হয়ে গেল"।[১৮] এরই সঙ্গে কবি আরেকটি বেদনার কথা উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে তৎকালীন সমাজের কাছ থেকে তিনি কীভাবে নিন্দিত ও অবহেলিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'দুঃখ হয়, এদেশে কেন জন্মালাম– এই নিন্দুকের হিংসুকের দেশে'।

মানুষের জীবনে মাঝে মাঝে এমন অবস্থারও সৃষ্টি হয়, যখন সে নিজেকে ভাবে জীবনযুদ্ধে পরাজিত। মুরলী ধরকে লেখা এক পত্রে এমনি দুজন সাহিত্যিকের হতোদ্যম অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। নজরুল লিখেছেন;

> আজ সকালে শৈলজার চিঠি পেয়েছি, চিঠি ত নয়
> বুক চাপা কান্না। দুই বাল্যবন্ধু যৌবনের মাঝ
> দরিয়ায় এসে পরস্পরের ভরাডুবি দেখছি কারণ
> কিছু করবার শক্তি নেই। ..... যত ভাঙ্গা তরীর ভিড়
> এক জায়গায়।[১৯]

---

১৮. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-৩৭. পৃ.-৫৪

১৯. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-২৯, পৃ.-৪২

আনোয়ার হোসেনকে লেখা দুটি পত্র বিশেষ তাৎপর্যময়। এখানে আনোয়ার হোসেনের লেখা পত্রের উত্তরে কবি কাব্যচর্চার উদ্দেশ্য এবং কবির ধর্ম সম্পর্কে কিছু উক্তি করেছেন, যা পরোক্ষভাবে তৎকালীন খড়্গ-হস্ত মুসলমান সমাজের সমালোচনা করে লেখা ২৩ শে অগ্রহায়ণ ১৩৩২ তারিখে লেখা এ পত্রে তিনি লিখেছেন:

মুসলমান সমাজ কেবলই ভুল করেছে আমার কবিতার সঙ্গে আমার ব্যক্তিত্বকে অর্থাৎ নজরুল ইসলামকে জড়িয়ে। আমি মুসলমান কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির। কবিকে হিন্দু কবি মুসলমান কবি ইত্যাদি বলে বিচার করতে গিয়েই এত ভুলের সৃষ্টি।[২০]

এ পত্রেরই অন্যত্র তিনি লিখেছেন একটি চিরন্তন আপ্ত বাক্য– "ধর্মের কড়াকড়ির মধ্যে কবি বা কবিতা বাঁচেও না, জন্মও লাভ করতে পারে না।"[২১]

---

২০. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-১৪, পৃ.-১০

২১. প্রাগুক্ত, পত্রনম্বর-১৪ পৃ.-১০

তথ্যনির্দেশ

১। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী-১ম খণ্ড, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, ২৫ মে ২০০৬, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২। শাহাবুদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), নজরুলের পত্রাবলী, মে ১৯৯৫, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
৩। প্রতিভা বসু, জীবনের জলছবি, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

উপসংহারঃ

কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যচিন্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাহিত্যকে তিনি নিছক বিলাস বা আনন্দ-সৌন্দর্যের বস্তু মনে করেননি। সাহিত্য যে একটি মহৎ শিল্পসৃষ্টি এবং তা যে উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়, বরং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যও যে মহৎ, সে সম্পর্কে তাঁর ধারণায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না।

সাহিত্য আনন্দ দেবার পাশাপাশি মানুষের চৈতন্য রূপান্তরে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে। এ ধারণা তাঁর সাহিত্য চিন্তায় ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, একথা ঠিক যে, তাঁর সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সর্বত্র সমানভাবে প্রতিফলিত হয়নি। অবশ্য তা সব সময় সবার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়; সে সম্পর্কেও তাঁর স্পষ্ট ধারণা ছিল।

কাজী নজরুল ইসলামের গদ্যসাহিত্যে সমকালীন সময়, সমাজ এবং নজরুলের নিজস্ব ভাবনার বৈচিত্র্য, এই অভিসন্দর্ভের উপর পর্যালোচনাটি করা হলো। আমি পর্যালোচনাটি পৌনঃপুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। তারপরও বলা যায় এটি অভিসন্দর্ভের পর্যাপ্ত পর্যালোচনা নাও হতে পারে। তিনটি উপন্যাস, উনিশটি ছোটগল্প, অভিভাষণ, প্রবন্ধ এবং তাঁর ব্যক্তিগত চিঠিপত্রসমূহ থেকে আলাদা আলাদাভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। নজরুলের সমাজভাবনা কতটা গভীর ছিল, তিনি সমাজের কতটা ভেতরে পদচারণা, অন্তর্চালনা করেছিলেন– তা তাঁর এসব গদ্যরচনায় পাওয়া যায়।

সমকালীন সমাজভাবনা নিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের আগে আরো অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু তাদের কথা সাহিত্যে তৎকালীন সমাজভাবনায় সমকালীন সমাজের ইতিহাসকে ঠিক তেমন করে খুঁজে পাওয়া যায় না, যেমন করে পাওয়া গিয়েছে নজরুলের ভাবনায়। খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার, ক্ষুধার যন্ত্রণায় ধর্মান্তকরণ, সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্প্রদায়িকতা, বাল্যবিবাহ, প্রথম মহাযুদ্ধ, রুশ-

বিপ্লব, স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন– এসব সমকালীন ঐতিহাসিক সত্যে জাজ্বল্যমান। চরিত্রগুলো তাই একই সঙ্গে সমাজের, আবার নিজেরও। এখানে তিনি সমষ্টিক চেতনাকে যেমন গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন, তেমনি ব্যক্তির বিকাশও ঘটিয়েছেন সূক্ষ্মভাবে।

উল্লেখ্য পর্যালোচনার সময় কোথাও কোথাও এক উদ্ধৃতি একাধিকবার ব্যবহার করতে হয়েছে এবং কোথাও কোথাও খানিক দীর্ঘ হয়েছে। তাছাড়া একই কথার পুনরাবৃত্তিও ঘটেছে হয়তো কোথাও। নজরুলের গদ্যসাহিত্যের উপর কাজ করতে গিয়ে একটি কথা খুব স্পষ্ট করে জেনেছি আমি যে, 'সমকালীন সমাজ প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতে একটি উৎকৃষ্ট কথাসাহিত্য একটি সমকালীন সমাজের ইতিহাসকে ধরে রাখে'।

কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস ও ছোটগল্পের বক্তব্য বিষয় প্রাধান্য পাওয়ায় এখানে আঙ্গিক-পরিচর্যা ব্যাহত, একথা বলা যাবে না পুরোপুরি। তবে তাঁর অভিভাষণ ও প্রবন্ধে তিনি যে সার্থক এবং জোরালা বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন তা যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে। তবে একথাও সত্য যে উপন্যাস ও ছোটগল্পে শিল্প সফলতা একইভাবে আসেনি। কোথাও গদ্যে এসেছি ঢিলেমি, কোথাও স্ফীত আবার কোথাও অগোছানোভাব লেখার সংহতিকে করেছে বিঘ্নিত। এই বিচ্যুতি কাজী নজরুল ইসলামের রচনার সুবর্ণ অর্জনসমূহের তুলনায় সামন্যই।

আকরগ্রন্থাবলি

১। কাজী নজরুল ইসলাম, বাঁধন-হারা (২০০৬), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
২। কাজী নজরুল ইসলাম, মৃত্যুক্ষুধা (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৩। কাজী নজরুল ইসলাম, কুহেলিকা (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৪। কাজী নজরুল ইসলাম, ব্যথার দান (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৫। কাজী নজরুল ইসলাম, রিক্তের বেদন (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৬। কাজী নজরুল ইসলাম, শিউলিমালা (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৭। কাজী নজরুল ইসলাম, যুগবাণী (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৮। কাজী নজরুল ইসলাম, দুর্দিনের যাত্রী (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৯। কাজী নজরুল ইসলাম, রুদ্রমঙ্গল (২০০৭), বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
১০। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুলের পত্রাবলী (১৯৯৫), ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১। রফিকুল ইসলাম, কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃজন, ২০১২, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

২। রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী, ২০১৩, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

৩। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড, ২০০৬, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা, ২০০৬

৪। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৫। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৬। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৭। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৫ম খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৮। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০০৭, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

৯। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, ২০০৮, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১০। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, ২০০৮, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১১। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, ২০০৯, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১২। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ১০ম খণ্ড, ২০০৯, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১৩। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ১১ম খণ্ড, ২০১০, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১৪। কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, ১২ম খণ্ড, ২০১১, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা।

১৫। শাহবুদ্দীন আহমদ (সম্পাদিত), নজরুলের পত্রাবলী, ১৯৯৫, ঢাকা।

১৬। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, আমার বন্ধু নজরুল, ১৩৭৫, কলকাতা।

১৭। সৌমিত্র শেখর, নজরুল: আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এবং শিল্পীর বোধ, ২০১৩, নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

১৮। শাহবুদ্দীন আহমদ, নজরুলের গদ্যে উপমা, ২০০০, ঢাকা
১৯। আবু হেনা আবদুল আউয়াল, নজরুলের সাহিত্য চিন্তা ও তাঁর সাহিত্য, ২০১০ নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।
২০। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, নানা প্রসঙ্গে নজরুল, ২০০২, ঢাকা।
২১। সৌমিত্র শেখর, সত্যেন সেনের উপন্যাসে জীবন ও শিল্পের মিথস্ক্রিয়া, ২০০৭, ঢাকা।
২২। আবদুল মান্নান সৈয়দ (সংকলিত ও সম্পাদিত), শ্রেষ্ঠ নজরুল, ১৯৯৬, ঢাকা।
২৩। রাজিয়া সুলতানা, কথাশিল্পী নজরুল, ১৯৯৫, ঢাকা।
২৪। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (সম্পাদিত), নজরুল ও নাসির উদ্দীন স্মারকগ্রন্থ, ১৯৯৫, ঢাকা।
২৫। খোন্দকার শওকত হোসেন (সম্পাদিত), জাতীয় পর্যায়ে নজরুল-জন্মবার্ষিক উদযাপন স্মারকগ্রন্থ, ১৯৯৫, ঢাকা।
২৬। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (সম্পাদিত), জাতীয় পর্যায়ে নজরুল-জন্মবার্ষিক উদযাপন স্মারকগ্রন্থ, ১৯৯৪, ঢাকা।
২৭। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ (সম্পাদিত), জাতীয় পর্যায়ে নজরুল-জন্মবার্ষিক উদযাপন স্মারকগ্রন্থ, ১৯৯৩, ঢাকা।
২৮। হামীন কামরুল হক, মৃত্যুক্ষুধা গতি প্রকৃতি ও পাঠ বিবেচনা, ২০০০, ঢাকা।
২৯। মোবাশ্বের আলী-নজরুল ও সাময়িকপত্র, ১৯৯৩, ঢাকা।
৩০। ড. সৌমিত্র শেখর, ছোটগল্প ॥ ভূমিকা, কাজী নজরুল ইসলাম-এর ছোটগল্প, ২০১৭, জোনাকী প্রকাশনী, ঢাকা।
৩১। অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক (সম্পাদিত), উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন, ২০০৭, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৩২। প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন (ও অন্যান্য সম্পাদিত), ২০০৭, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।
৩৩। সাহিত্যকণিকা, ২০১২, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

নির্দেশনা:

ড. সৌমিত্র শেখর
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

প্রস্তাবনা:

তামান্না কবীর
এম. ফিল গবেষক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

ছবিতে কবি কাজী নজরুল ইসলাম

গান পাগল কবি বাঁশি বাজাচ্ছেন

প্রতিভা বসুর সাথে কবি

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী ও দুই সন্তানের সাথে কবি

Dhaka University Institutional Repository

ধানমন্ডি কবি ভবনে বাঁ থেকে— উমা কাজী, মিষ্টি কাজী, কবি নজরুল বাবুল কাজী ও খিল খিল কাজী

প্রিয় পরিবারের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

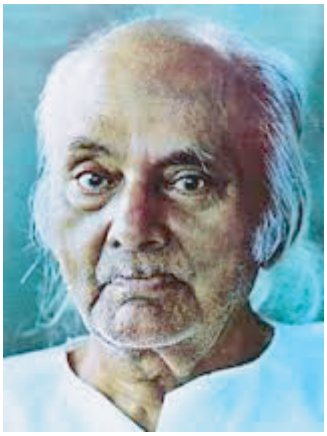

অসুস্থ, নির্বাক কবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে চির ঘুমে কবি কাজী নজরুল

ছবি সূত্রঃ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত।